নববিধান কি ?

নববিধান কি ?

কৃষ্ণবিহারী সেন

প্রণীত।

কলিকাতা।

৫৯।৩ নং ভবানিচরণ দত্তের লেন হইতে

শ্রীকুমুদবিহারী সেন দ্বারা প্রকাশিত।

১৮৯৬

পিপেল্স্ প্রেস
৮০ মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীচন্দ্রনাথ গুহ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নববিধান কি ?

প্রথম অধ্যায়।

—::—

নববিধান বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর কি এবং তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ কি ইহা জানা উচিত। বিধান বলিলেই বিধাতা বুঝায় এবং ঈশ্বরকে বিধাতা বলিয়া না বুঝিলে বিধান বুঝা যায় না। নববিধান বিশ্বাস করিবার পূর্ব্বে ঈশ্বর আছেন এটী বিশ্বাস করিতে হইবে। কিন্তু কেবল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিলে হইবে না। ঈশ্বর জীবন্ত, সদা জাগ্রত, সগুণ ঈশ্বর বলিয়া না বুঝিলে এ ধর্ম্ম বুঝা যায় না। অনেকে এই সম্বন্ধে স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া নববিধানকে কোন মতে বুঝিতে পারেন না।

জগতে ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে দুটী মত প্রচলিত আছে, এবং সেই দুটী মত আছে বলিয়াই বিধান বিশ্বাসের পক্ষে দুই প্রধান প্রতিবন্ধক পদে পদে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাহার মধ্যে একটী মত নির্গুণ ঈশ্বরবাদ এবং আর একটী নিয়মাধীন ঈশ্বরবাদ। পাঠক এই দুই মতকে ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করুন। যে হেতু ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিবার সময়েই আকাশের কুজ্ঝটিকা সমূহ দূরীকৃত হওয়া উচিত। যদি ভ্রমণের আরম্ভেই অন্ধকাররাশি চারিদিক্ আবরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পথ ভুলিবার সম্ভাবনা থাকে, এবং একবার পথ হারাইলে প্রকৃত পথ পাইবার পক্ষে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়।

প্রথম মত নির্গুণ ঈশ্বরবাদ। ইহা ভারতে বিশেষরূপে প্রচলিত। বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা অনেক বুদ্ধি সঞ্চালনা করিয়া দেখিয়াছেন যে যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি নির্গুণ ছাড়া সগুণ হইতে পারেন না। নির্গুণ এই কথার অর্থ কি তাঁহার কোন গুণ নাই, একেবারে অপদার্থ পুরুষ? না, তাহা নহে। তাঁহারা বলেন যে অন্তবিশিষ্ট পদার্থের গুণ আছে। গুণ অর্থ যাহা দ্বারা পদার্থসমূহকে জানা যায়। যথা, দীর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চ, ব্যাপ্ত, বর্ণবিশিষ্ট, গুরু, কান্ত, ভাল, মন্দ, সুন্দর ইত্যাদি। সকল সৃষ্টপদার্থই গুণের দ্বারা গোচর হয়। গুণ না থাকিলে আমরা কোন পদার্থকেই অনুভব করিতে পারি না। মনে কর আমি একটী ঘড়ী

দেখিতেছি। ঘড়ী মানে একটী পদার্থ যাহা গোল, চক্‌মকে, টক্ টক্ শব্দ করে, সাদা কিম্বা সুবর্ণ, চোস্ত, পুরু ইত্যাদি। আচ্ছা, কোন প্রকারে এই গুণগুলি ঐ পদার্থ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লও দেখি ? তাহা হইলে কি অবশিষ্ট থাকে ? কিছুই নহে। সুতরাং গুণগুলি আমরা প্রত্যক্ষ করি, পদার্থটী কি ইহা জানিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ঘড়ী বলিয়া একটী পদার্থ আছে, তাহা বিশ্বাস করি। কিন্তু সে পদার্থটী কি তাহা জানি না, কেবল গুণদ্বারা ইহা আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। সেই জন্য বলিতেছি যে সৃষ্ট সকল পদার্থই সগুণ।

পদার্থসমূহকে পণ্ডিতেরা বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম শ্রেণীর ভিতর ক্ষুদ্রতর শ্রেণী, এবং ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর ভিতর ক্ষুদ্রতম শ্রেণী আছে। শ্রেণীর ভিতর শ্রেণী, তাহার ভিতর শ্রেণী, এইরূপে সমুদয় সত্তার প্রকাণ্ড গোলাকার গঠিত হইয়াছে। প্রত্যেক শ্রেণীর পদার্থের গুণ আছে, কেন না গুণ না থাকিলে পৃথিবীর কোন পদার্থকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। নিম্নে একটী তালিকা দিতেছি; তাহাতে একদিকে শ্রেণী সকলের নাম উল্লিখিত হইল, এবং অপর দিকে তাহাদিগের গুণগুলি দেওয়া হইল। পাঠকেরা মনোযোগের সহিত এইটী পাঠ করুন। তাহা হইলে যাহা বলিতেছি তাহা বোধগম্য হইবে :—

শ্রেণীর নাম।	গুণের নাম
সত্তা	আছে
প্রাণবিশিষ্ট সত্তা (যথা চেতন এবং উদ্ভিদ) ...	আছে এবং বর্দ্ধনশীল
পশু (চেতন)	আছে, বর্দ্ধনশীল এবং সংজ্ঞাযুক্ত
মনুষ্য	আছে, বর্দ্ধনশীল, সংজ্ঞাযুক্ত এবং প্রজ্ঞাবান
শঙ্করাচার্য্য	আছে, বর্দ্ধনশীল, সংজ্ঞাযুক্ত, প্রজ্ঞাবান এবং অদ্বৈতবাদী।

উচ্চতম শ্রেণীর নাম সত্তা, অর্থাৎ যাহা কিছু আছে। তাহার ভিতর চেতন এবং উদ্ভিদ অর্থাৎ প্রাণ বিশিষ্ট সত্তা। তাহার ভিতর পশু, পশুর ভিতর মনুষ্য এবং মনুষ্যের ভিতর শঙ্করাচার্য্য। গুণের দিকে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই যে শ্রেণী যত ক্ষুদ্রায়তন হইতেছে, তত তাহার গুণ বাড়িতেছে। শঙ্করাচার্য্যের পাঁচটী গুণ, মনুষ্যের চারিটী, পশুর তিনটী, চেতন এবং উদ্ভিদের দুইটী এবং সত্তার একটী গুণ। সত্তা এবং তাহার গুণ "আছে" এই দুয়েরই এক অর্থ। সত্তা মানে "যাহা আছে"। সুতরাং এই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে গুণ কিছুই নাই। যাহা আছে তাহা সত্তা, যাহা সত্তা তাহা আছে। ইহাই নির্গুণ এবং ইহাকেই পণ্ডিতেরা ব্রহ্ম বলেন। সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী ব্রহ্ম, ইনি আছেন, ইঁহার কোন গুণ নাই, ইনি ভূমা, মহান্, অনাদি, অনন্ত। সমুদয় বিশ্ব এবং ইনি এক, এক পদার্থ, একমেবাদ্বিতীয়ম্।

এই পরম পদার্থের কোন ইচ্ছা নাই। ইনি কিছুই

করিতে পারেন না। কেননা কোন কার্য্য করিতে গেলেই ইঁহাকে ইচ্ছা করিতে হইবে। ইচ্ছা করা একগুণ এবং গুণ থাকিলেই ইঁহাকে একটি নিকৃষ্ট শ্রেণীর ভিতর অন্তর্ভূক্ত হইতে হয়। আর সত্তা থাকে না। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন তবে তিনি সৃষ্টি করিতে পারিলেন কেমন করিয়া? ইহার উত্তর যে তিনি নিজে সৃষ্টি করেন নাই। মায়া বলিয়া একটী শক্তি ছিল তাহার দ্বারা তিনি বিশ্ব সৃষ্টি করাইয়া লইয়াছেন। সেই মায়া দ্বারা তিনি এক ছিলেন এবং তিনিই অনেক হইলেন। অর্থাৎ এই বিশ্ব তিনিই সেই সত্তা; কেবল তাঁহারি রূপান্তর মাত্র। সুতরাং যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই তিনি আর একরূপে। জীবেরা ভ্রম বশতঃ আপনার আপনার করে। যখন সেই ভ্রম দূর হয় তখন আবার তাহারা সেই অনন্ত সত্তাতে লীন হইয়া যায়।

কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম লইয়া লোকে থাকিতে পারে না। সেই জন্য ভারতে সগুণ দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আমরা নির্গুণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারি না। যেহেতু আমরা সাকার, :অন্তবিশিষ্ট, সগুণ। আমরা যাহা ভাবি তাহার একটী আকার আছে, তাহার আদি অন্ত আছে এবং তাহার গুণও আছে। সুতরাং তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। এ ব্রহ্মকে লইয়া আমাদিগের প্রয়োজন কি? যাঁহাকে ভাবিতে পারিলাম না সে ব্রহ্মকে লইয়া আমি কি করিব? নববিধানের ঈশ্বর নির্গুণ নহেন, তিনি সগুণ।

পদার্থ না থাকিলে গুণ থাকিতে পারে না। "ভাল" বলিয়া পৃথিবীতে কোন সত্তা নাই। কিন্তু ভাল মানুষ, ভাল ফুল, ভাল খাদ্য ইহা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কোন পদার্থের সহিত যুক্ত না হইলে ভাল এ কথার কোন অর্থ নাই। গুণকে পদার্থ হইতে পৃথক করা যায় না। পদার্থ থাকিলেই গুণ আছে, গুণ থাকিলেই পদার্থ আছে। আমি অন্তবিশিষ্ট, সীমাবদ্ধ, আমার সকলই সঙ্কীর্ণ ও বদ্ধ। কিন্তু অন্তবিশিষ্ট বলিলেই অনন্ত বলিয়া গুণের ভাব হয়। ছোট বলিলেই বড় এই গুণের ভাব হয়। আমাদিগের ভিতর দয়াভাব আছে, তাহা বলিলেই অনন্ত দয়া আছে বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং আমাদিগের মন অন্তবিশিষ্ট, সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহা অনন্ত, অসীম ভাবকে উপলব্ধি করিতে পারে। এখন পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে পদার্থ না থাকিলে গুণ থাকিতে পারে না। অতএব অনন্ত কোন পদার্থ না থাকিলে অনন্তের ভাব থাকিতে পারে না। অবশ্যই তবে অনন্ত ব্রহ্ম আছেন, এবং আমরা তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। এইরূপে তাঁহার অনন্ত দয়া, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত ব্যাপ্তি, আমরা অনুভব করিতে পারি। আমি আছি বলিলেই অনন্ত পরব্রহ্ম আছেন ইহা প্রমাণিত হইল। আমি পাপী, অসম্পূর্ণ, ইহা বলিলেই পুণ্যবান, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সম্পূর্ণ পরমেশ্বর আছেন ইহা প্রমাণিত হইল। আমরা অনন্ত দ্বারা চারি দিকে বেষ্টিত আছি। দেখ, আকাশের অন্ত আমরা কল্পনা করিতে পারি না। কালের অন্ত কোথা?

গুণ সমূহ, যথা, দয়া, পুণ্য, সৌন্দর্য্য—ইহাদিগের শেষ কোথাও নাই। আমার মন—ইহার উন্নতির কি শেষ আছে? ইহা আজ ভাল, কাল আরও ভাল, তাহার পর আরও ভাল হইতে পারে। ভাল হইবার শেষ কোথা? সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের অন্ত নাই। সেই জন্য বলিতেছি যে আমাদিগের অন্তবিশিষ্ট স্বভাবের সহিত অনন্তের সম্বন্ধ আছে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন অনন্ত আছেন ইহার প্রমাণ কি? আমি বলিব, অন্ত আছে বলিয়া, আমি আছি বলিয়া। অন্ত আছে, সেই জন্য অনন্ত আছেন। অন্তবিশিষ্ট পদার্থ আছে, সেই জন্য অনন্ত পদার্থও আছেন। আমাদের ক্ষুদ্রমন অনন্তকে ধরিতে পারে। নববিধান বিশ্বাসী হইলে সগুণ, অনন্ত পরমেশ্বরকে বিশ্বাস করিতে হয়।

অদ্বৈতবাদ ভারতের, নিয়মাধীন ব্রহ্মবাদ ইউরোপের। এই দ্বিতীয় মতটীর সংক্ষেপতঃ এইরূপ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ঈশ্বর নিত্য, স্থায়ী; সুতরাং তাঁহার নিয়মগুলিও নিত্য ও স্থায়ী। ব্রহ্ম জগত সৃষ্টি করিয়া ইহাতে নিয়মাবলি চালাইয়া দিলেন। সেই নিয়মের অধীন হইয়া জগৎ এখনও চলিতেছে এবং চিরকাল চলিবে। ঈশ্বর এই নিয়মাবলি কখন পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। সুতরাং তাঁহার থাকিবার আর কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। কেন না নিয়ম অনুসারে সমুদয় বিশ্ব-

নিয়মাধীন ব্রহ্ম।

সংসার চলিতেছে। আমরা তাঁহাকে পূজা করি বা প্রার্থনা করি, তিনি নিয়মাধীন। আমাদিগের কথা তিনি শুনিতে পারেন না। সেই জন্য মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম কেবল তাঁহার নিয়মগুলি পালন করা মাত্র। নিয়ম পালন না করা অধর্ম্ম এবং সেই অধর্ম্মজনিত দণ্ড আপনা আপনি আসে। কোন এক জন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল পরমাণুরাশি বিশৃঙ্খল ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। ব্রহ্ম কেবল অঙ্গুলি দ্বারা সেই পরমাণুপুঞ্জতে একটী মাত্র "টোকা" মারিলেন আর সেই শক্তি সহকারে পরমাণুবৃন্দ ঘুরিতে লাগিল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহা হইতে উত্তাপ উদ্ভূত হইল, এবং উত্তাপ হইতে এক প্রকাণ্ড অগ্নিময় মণ্ডল দৃষ্ট হইল। সেই মণ্ডল আদি সূর্য্য। সূর্য্য ঘুরিতে ঘুরিতে তন্মধ্যভাগ স্ফীত হইয়া উঠিল এবং অবশেষে সেই মধ্যভাগটী এক প্রকাণ্ড অগ্নিময় অঙ্গুরীয়ের ন্যায় হইয়া সূর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। সেই অঙ্গুরীয় ঘুরিতে ঘুরিতে চলিতে লাগিল। অবশেষে সূর্য্যের আকর্ষণ প্রভাবে আর যাইতে পারিল না। তাহা সূর্য্যের চারিদিকেই ঘুরিতে লাগিল। ইহা কালক্রমে শীতল হইয়া একটী মণ্ডলরূপে নেপচুন গ্রহ নামে অভিহিত হইল। এই-রূপে ক্রমান্বয়ে ইউরেণস্, মঙ্গল, বৃহস্পতি, পৃথিবী, শুক্র এবং বুধ গ্রহ সকল সমুদ্ভূত হয়। পৃথিবী হইতে আবার মধ্যভাগ বিক্ষিপ্ত হইয়া চন্দ্ররূপ ধারণ করিল। কালক্রমে পৃথিবীর অগ্নির নির্ব্বাণ হইল; বাষ্পরাশি হইতে জল আসিল; জলে

প্রথমতঃ উদ্ভিদ জন্মাইল; উদ্ভিদ হইতে জলজন্তু, জলজন্তু হইতে অন্যান্য জীব, অবশেষে মনুষ্য জন্মগ্রহণ করিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে আদি পরমাণুরাশিতে শক্তি সকল নিহিত ছিল। পরমেশ্বর একটী "টোকা" মারিলেন। তাহার পর শক্তিপ্রভাবে সমুদয় জগত, জীবজন্তু, মনুষ্য, জ্ঞান, বিবেক, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতি সকলই ক্রমশঃ উদ্ভূত হইল। পরমেশ্বর থাকিতে পারেন এবং আছেন। কিন্তু তাঁহার নিজ হস্তে কার্য্য করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। সেই প্রথম টোকা মারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত আছেন।

ঈশ্বরকে এইরূপ ভাবে কল্পনা করিয়া ইউরোপের বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাঁহার বিধানকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। ভগবান যে আপনার হস্তে বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনার চক্ষে সকলই দেখিতেছেন ইহা তাঁহারা স্বীকার করেন না। রাজনীতি এখন ঈশ্বরের নিয়মের উপর স্থিত নহে। বিবেক আর কিছুতেই মানব হৃদয়ে স্থান পায় না। কোন্ নিয়ম হইতে অধিক উপকার লাভ করা যায়, কার্য্যের ফলাফল চিন্তা করিয়া রাজপুরুষেরা দেশ শাসন করেন। ধর্ম্মকে ডাকিয়া, ঈশ্বরকে লইয়া কার্য্য করা আর অধিক হইতেছে না। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এ সকলে আর বিধাতার হস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রকৃতির শোভাতে ভগবানের শিল্প নৈপুণ্য কিছুই নাই। জন্তুদিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রচনায় তাঁহার কৌশল আর দেখা যায় না। সকলই অবস্থার ফল;

অনেক কাল অবস্থায় সাতুত যুদ্ধ করিতে করিতে আমাদিগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। ঈশ্বর আপনার জগত, আপনার সৃষ্টি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া আমাদিগের কষ্ট হয়।

এখন, জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে এরূপ ঈশ্বর কি নিতান্ত উপহাসের পদার্থ না হইয়া যান? তিনি কেবল একটী "টোকা" মারিয়া বসিয়া আছেন, আর তাঁহার কোন কার্য্য নাই। আপনা আপনি সকলই হইতেছে। পণ্ডিত-দিগের এতদূর বিদ্যার প্রভাব দেখিয়া ভক্ত স্তম্ভিত হইয়া যান। তাঁহারা বাস্তবিক সবই বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছেন। কেবল একটী ব্যাপার আজ পর্য্যন্ত বুঝাইতে পারেন নাই। তাঁহারা জড় জগত কিরূপে অস্তিত্ব লাভ করিল তাহা দেখাইতে পারিয়াছেন, কিন্তু জীবন বলিয়া যে একটী পরম পদার্থ আছে সেটী জড় হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইল তাহা এপর্য্যন্ত প্রমাণ করেন নাই। একটী ডিম্বে যে যে পদার্থ বর্ত্তমান আছে তাহা তাঁহারা একত্রিত করিয়াছেন। ঠিক ডিম্বের মত দেখিতে ডিম্বও প্রস্তুত করিয়াছেন কিন্তু সে ডিম্ব হইতে শাবক উৎপন্ন হয় নাই! জীবন পদার্থটী যে কি ইহা কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। বানর হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছে ইহার অনেক প্রমাণ দিয়াছেন। কিন্তু বানর হইতে মনুষ্য বুদ্ধিটী কেমন করিয়া আসিল তাহা এপর্য্যন্ত প্রদর্শিত হয় নাই। মানুষেরা কথা কহিতে

পারে, মানুষ হাসিতে পারে—ভাষা এবং হাস্য এদুটী বুদ্ধির আনুষঙ্গিক। ইহারা কেমন করিয়া বালকের মুখ হইতে বাহির হইল ইত্যাদি কেহই বুঝাইতে পারেন নাই। পণ্ডিতেরা যদি বুদ্ধি দ্বারা জীবনী শক্তিকে সৃজন করিতে পারেন, তাহা হইলে বুঝিব যে ভগবান নাই। একটী ক্ষুদ্রতম বীজের ভিতর অসংখ্য জীব কিম্বা উদ্ভিদের প্রাণ নিগূঢ় ভাবে অবস্থিতি করিতেছে। সেই বীজ গর্ভে প্রয়োগ করিলে কিম্বা ভূমিতলে পড়িলে তাহা হইতে অসংখ্য অসংখ্য জীব ও বৃক্ষ অসংখ্য বৎসর ধরিয়া উৎপন্ন হয়। এই সামান্য বীজে প্রকাণ্ড জীবনীশক্তি নিহিত আছে। এটী ভগবান ব্যতীত আর কে দিতে পারেন? একটী পরমাণুর ভিতর অনন্তশক্তি নিগূঢ় ভাবে বিরাজ করিতেছে এ তত্ত্ব কে বুঝিতে পারে?

বিধানের ঈশ্বর।

বিধানের ঈশ্বর নির্গুণ নহেন, এবং তিনি নিয়মাধীন জীবও নহেন। তিনি প্রাণ হইয়া সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান। আমাদিগের শরীরের ভিতর প্রাণ যেমন সর্ব্বস্থানে আছে, তেমনি প্রাণস্বরূপ ভগবান সর্ব্বস্থানে বর্ত্তমান। কোন একটী স্বর্গ বলিয়া বিশেষ স্থানে তিনি আবদ্ধ নহেন। তিনি প্রাণরূপে আছেন, আবার শক্তিরূপেও আছেন। সমুদয় জড় জগতের ভিতর শক্তি বর্ত্তমান। শক্তি না থাকিলে

এই বিশ্ব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া সেই আদিম বিশৃঙ্খলাতে পরিণত হইত। পদার্থ সমুদায়ে উত্তাপ, তড়িৎ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক, পরমাণুর আকর্ষণ প্রভৃতি শক্তি পরস্পর পরস্পরকে নিবৃত্ত করিয়া রাখিয়াছে, এবং সেই সমুদয় শক্তিকে এক পরম শক্তি ইচ্ছামত চালাইতেছেন। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি শক্তিকে এক শক্তির রূপান্তর বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। আমরা বলি যে বিশ্বে যত শক্তি বর্ত্ত-মান আছে, সকলই সেই পরমাশক্তির রূপান্তর। তিনি আমাদিগের জীবনী শক্তি; তিনি মস্তিষ্কে থাকিয়া মানসিক শক্তি বিধান করিতেছেন; তিনি আবার হৃদয়ের আদি স্থানে থাকিয়া রক্তস্রোত সঞ্চালিত করিতেছেন; নিশ্বাস নলিতে থাকিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাইতেছেন। সেই পরম পুরুষ অন্নে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাতে উপজীবিকা শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তিনি সাধুর হৃদয়ে থাকিয়া শুভ বুদ্ধি, নবোদ্যম, নব পরাক্রম যোগাইতেছেন। বজ্রে তিনি, সূর্য্যে তিনি, অনলে, অনিলে তিনি, অন্নে তিনি, বস্ত্রে তিনি, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডে শক্তিভাবে বর্ত্তমান।

প্রাণ এবং শক্তি হইলে তিনি নিরাকার হইলেন। প্রাণ কখন শরীরী হইতে পারে না। আমাদের ভগবান চিন্ময়, অনন্ত, দয়াল এবং পুণ্যময়। তিনি ভাব এবং চিন্তা, এবং তাঁহার শরীর নাই, বলিয়া, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সংযোগ নাই বলিয়া, সংসারের কার্য্যে থাকিতে হয় না বলিয়া, তিনি

বিশুদ্ধ ভাব এবং বিশুদ্ধ চিন্তা। তিনি যে রাজ্যে বর্ত্তমান, যে আকাশে স্থিত, সেখানে রিপুঘটিত প্রবল বাত্যা বহে না, সেখানে পাপ নাই, পাপের উত্তেজনা নাই। সকলই স্থির, শান্ত, আনন্দময়। সে ভাবের মৃত্যু নাই, শেষ নাই। আমাদিগের ঈশ্বর অনন্ত, জীবন্ত, জাগ্রত, অনন্ত গুণে বিভূষিত, সদা জগতের ভার বহন করিতেছেন; অসংখ্য শক্তি অবলম্বন করিয়া বিশ্বসংসার চালাইতেছেন; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তারকা মণ্ডল হইতে ক্ষুদ্রতম পরমাণুপুঞ্জ সকলই নিজ হস্তে চালনা করিতেছেন।

ভগবানের তিন প্রকার প্রকাশ।

যে ভগবানের কথা বলিলাম তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করা প্রত্যেক ভক্তের বিশেষ কার্য্য। আর তাহার প্রমাণ পাওয়া অনেক কষ্টের ব্যাপার নহে। প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিশ্বাস প্রশ্বাসে তিনি আপনার অস্তিত্ব প্রচার করেন। তিনি অদৃশ্য হইয়াও আমাদিগের প্রত্যক্ষ আছেন। বহির্জ্জগতে, অন্তর্জ্জগতে ক্রমাগত তিনি "আমি আছি, আমি আছি" বলিয়া দিতেছেন। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই যে তিনি তিন ভাবে বিশ্বে প্রকাশিত হন।

১। পিতা ভাবে। বিশ্বের স্রষ্টা, পাতা এবং পিতা তিনি। এ ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিলে তাঁহার প্রমাণ অতি হাতে হাতে পাওয়া যায়। আকাশের দিকে তাকাইলে দেখি

যে তিনি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জগৎ সৃষ্টি করিয়া চালাইতেছেন। একটি একটি নক্ষত্র, একটি একটি সূর্য্য, অগ্নিময় গোলাকার। তাহার চারিদিকে আবার কত গ্রহ, উপগ্রহ ঘুরিতেছে। তাহাদিগের গতির বেগ ভাবিলে আর জ্ঞান থাকে না। এই পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। কত বেগে ঘুরিতেছে তাহা জান কি? একটি অঙ্ক কসা যাক। দেখ। পৃথিবী সূর্য্য হইতে ৯৩,০০০,০০০ মাইল দূরে। সূর্য্যকে একটি গোলাকারের মধ্যবিন্দু করিয়া লইলে, তাহার Diameter ১৮৬,০০০,০০০ মাইল হইবে। Diameter জানিতে পারিলে গোলাকারের পরিধি ঠিক করিতে পারা যায়। সেই Diameterকে ৩২/৭ দিয়া গুণ করিলে পরিধি হয়; অর্থাৎ সর্ব্বশুদ্ধ ৫৮৫,০০০,০০০ মাইল—এই গোলাকারের পরিধি দিয়া পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘূর্ণায়মান। ৫৮৫,০০০,০০০ মাইল পৃথিবীকে এক বৎসর ধরিয়া ঘুরিতে লাগে। যদি এত মাইল ৩৬৫ দিন যাইতে লাগে, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৬৭,০০০ মাইল ঘুরিবে। তাহা হইলে এক মিনিটে পৃথিবী ১,১১৬ ক্রোশ যায় এবং এক মুহূর্ত্তে ১৮ মাইল যায়। পাঠক বিবেচনা কর যে এই এক বলিলাম আর পৃথিবী ১৮ মাইল চলিয়া গিয়াছে। আমি এই পুস্তক খানি পরিধির ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে লিখিতেছি। পাঁচ মিনিট আগে আমি ১১১৬×৫=৫৫৮০ মাইল তফাতে লিখিয়াছি। তুমি কি ইহা কল্পনা করিতে

পার? অথচ আমাদিগের ভগবান প্রকাণ্ড অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত। তাঁহার কার্য্যে দিন, ঘণ্টা, মিনিট, মুহূর্ত্ত, মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশ ঠিক থাকে। ঠিক কোন্ সময় পৃথিবী কোন্ স্থানে থাকিবে, ঠিক কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ নক্ষত্র কোথায় দেখা দিবে, ঠিক কোন্ স্থানে কখন কোন্ গ্রহ আকাশে উদিত হইবে কি অস্ত যাইবে—এ সকল গণনা আমরা কাগজে কলমে করিয়া আকাশের প্রতি তাকাইলে দেখিব যে ঠিক সেই সময় সেই অদ্ভুত ব্যাপারগুলি ঘটিয়াছে। রেলওয়ে ট্রেণ এক মিনিট, কি পাঁচ মিনিট আসিতে যাইতে বিলম্ব হয়। কিন্তু সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রের রেলগাড়ী আকাশমার্গে দিন রাত্রি ঘুরিতেছে। অমুক ঘণ্টা, অমুক মিনিট, অমুক মুহূর্ত্ত, অমুক মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশের সময় পৃথিবী অমুক ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইবে ইহার অণুমাত্র ব্যতিক্রম হইবে না। বাস্তবিক এই আকাশের রেলগাড়ী দিয়া আমরা আমাদের ঘড়ী ঠিক করিয়া লই। ভগবানের রাজ্যে এক মুহূর্ত্তের ভগ্নাংশ মাত্র ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি সম্ভাবনা থাকিত তাহা হইলে ভগবানের না থাকিবার সম্ভাবনা ছিল। এইরূপ একটি ব্যতিক্রম হইলে রেলগাড়ী রেলগাড়ীতে ঠেকিয়া যাইত এবং এক মুহূর্ত্তে বিশ্ব প্রলয় উপস্থিত হইত। এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার কি বিনা কারণে ঘটিতে পারে? সেই জন্য বলিতেছি যে প্রতিদিন প্রতিমিনিট, প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আছেন ইহার প্রমাণ পাই-

তেছি। মানুষের রেলগাড়ীর শব্দে কর্ণ বধির হইয়া যায়, ইহা এক ঘণ্টায় যখন ৪০ মাইল যায়। আর এই পৃথিবীর রেলগাড়ী নীরবে এক মুহূর্ত্তে ১৮ মাইল যাইতেছে, অথচ আমরা কিছুই জানিতে পারিতেছি না।

বাস্তবিক ভগবানের কীর্ত্তি প্রকাশে যেমন আশ্চর্য্যকর, কার্য্যে তেমনি গুপ্ত এবং নিগূঢ়। পিতা হইয়া তিনি যে কার্য্যগুলি করেন তাহা গোপনে করেন—তাহা অন্য কাহারও হস্তে দেন না। সম্মুখে দেখিতেছি এক বৃহৎ বৃক্ষ দণ্ডায়মান। ইহা দেখিতে জড়, বায়ু সঞ্চালনে উদ্বেলিত হইতেছে। কিন্তু তাহা নহে। মাসে মাসে, বৎসরে বৎসরে দেখি যে ইহা বাড়িতেছে। ইহার জীবন প্রতি পত্রে, প্রতি শাখায়, প্রতি শিরায়। ইহার আদিস্থান চক্ষের সম্মুখে নহে। মাটীর ভিতরে। সেইখানে ইহার শিকড় ভূমি হইতে রস টানিয়া লইতেছে, সেই রস গুঁড়ি দিয়া, শাখার ভিতর দিয়া চারিদিকে সঞ্চালিত হইতেছে। আবার বায়ু হইতে ইহার নিশ্বাস প্রশ্বাসও দিনরাত্রি চলিতেছে। কে জানে এত ব্যাপার আমাদিগের অজ্ঞাতসারে ঘটিতেছে! মনুষ্যশরীর কি তাহা বিবেচনা কর। আমরা কার্য্য করি তাহা সত্য, এবং কার্য্য করিলে আমাদিগের শরীরও বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু জীবনের ভার আমাদিগের হস্তে ভগবান রাখেন নাই। রাত্রে নিদ্রাবস্থায় যখন অচেতন হইয়া থাকি তখন কি আমরা আমাদিগকে চালাইতে পারি? সেই

সময় আমরা স্পন্দরহিত থাকি বটে, কিন্তু নিশ্বাস প্রশ্বাসের এক মুহূর্ত্তের জন্য বিরাম হয় না। সে ভারটুকু সমস্ত জগৎপতার হাতে। তিনি এমন ভাবে কার্য্য করেন যে আমাদিগের শরীরের ভিতর জীবনের কল দিন রাত্রি চলিতেছে, অথচ আমরা তাহার কিছুই জানি না, কিছুই শুনি না। কে কোথা হইতে কার্য্যগুলি করিয়া দিতেছে তাহাও জানি না। তাঁহার আশ্চর্য্য দয়া—প্রতি হস্তে দেখিতেছি, জানিতেছি, অথচ কে করিতেছে তাহা জানি না।

ঈশ্বর পিতা হইয়া যে কার্য্য করিতেছেন তাহা আমরা বিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি। কি প্রকারে জীব জন্মিতেছে, কি নিয়মে বিশ্বের ব্যাপার সকল ঘটিতেছে, কোন্ অভিপ্রায়ে শরীরি প্রাণী গঠিত হইয়াছে, এ সমুদায়ই আমাদিগকে বিজ্ঞান বলিয়া দেয়। সমস্ত জড় জগতের ভিতর একটি মন কার্য্য করিতেছে, সেই মনকে আমরা চিন্ময় ব্রহ্ম বলি। তিনিই জগতের পিতা। আমরা যে পরিমাণে এই মনকে জানিতে পারি সেই পরিমাণে তাঁহার উপর আমাদিগের বিশ্বাস বাড়ে। আমরা যখন বিজ্ঞান পাঠে অবগত হই যে শয়নে, স্বপ্নে, জাগ্রতাবস্থায় সকল সময় তিনি আমাদিগের ভিতর কার্য্য করিতেছেন, নিশ্বাসে, প্রশ্বাসে, প্রত্যেক রক্তবিন্দুর স্রোতে, প্রতি অন্নের গ্রাসে তিনি, সম্মুখে, পশ্চাতে, অন্তরে, বাহিরে তিনি—তখন তাঁহার অস্তিত্ব জ্ঞানে আমরা পূর্ণ হই। তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিবার

কোন উপায় নাই। যখন কার্য্য করি দেখি তিনি বর্ত্তমান। তাঁহা হইতে গোপনে থাকিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। নিস্তব্ধ থাকিলেও তিনি বলিতেছেন "আমি আছি"। ভক্তের কার্য্য আর কিছু নহে—কেবল তাঁহার ঐ "আমি আছি" কথাটি শুনা। যাঁহারা বিশ্বাসী তাঁহারা ঐ রব দিন রাত্রি শুনিতেছেন। তাঁহাদিগের কর্ণে আর কোন কথা প্রবেশ করে না। যে লোক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তিনি বিজ্ঞানকে শাস্ত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। তাঁহার নিকট বিজ্ঞানই সার ধর্ম্ম পুস্তক। আমরা বিজ্ঞান দিয়া পিতার সমুদয় স্বরূপ অবগত হই। অতএব আমরা যেন বিজ্ঞানকে কখন তাচ্ছল্য না করি।

পুত্র।

ঈশ্বরের দ্বিতীয় প্রকাশ পুত্র ভাবে। পিতা আছেন ইহা তিনি আমাদিগকে আপনি বলিয়া দিতেছেন। কিন্তু পুত্র আছেন, অর্থাৎ আমরা তাঁহার পুত্র, এ কথা আমাদিগকে কে বলিয়া দিবেন? তিনিই বলিয়া দিতেছেন। তিনি পিতা হইয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং লালন পালন করিতেছেন। সুতরাং আমাদিগের তাঁহার সঙ্গে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে এবং সেই সম্বন্ধ আমাদিগের দিন দিন নিকটতর, নিকটতম করা উচিত। ভগবান যদি কেবল পিতা সম্বন্ধ আমাদিগের নিকট প্রচার করিতেন, তাহা হইলে আমাদিগের কি ধর্ম্ম হইত। তিনি পিতা আছেন তিনিই আছেন—

আমাদিগের তাঁহাতে কি ? বাস্তবিক পিতা কেবল থাকিতে পারেন না। পুত্র না থাকিলে পিতা এই কথার কোন মানে থাকে না। পিতা পুত্র এদুটি সাম্বন্ধিক কথা। একটি বলিলেই আর একটিকে বুঝায়। সেই জন্য পিতা আছেন বলিলেই, আমাদিগের ধর্ম্ম, কর্ত্তব্যশ্রেণী, সাধন, ব্রত প্রভৃতি সমস্তই প্রমাণিত হয়। পিতা আছেন, আমাদিগের তাঁহার প্রতি কোন কর্ত্তব্য নাই, ইহা কথনই হইতে পারে না।

কিন্তু এত বড় পিতার প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য আছে তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিব ? জ্ঞান সঞ্চালনে আমরা কতকটা তাহা জানিতে পারি। স্বতঃ সিদ্ধ প্রত্যক্ষ বুদ্ধিতে আমাদিগের মন সহজে, স্বভাবতঃ তাঁহার দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে হইলে তাঁহাকেই প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিতে হয়। তিনি 'দেখা না দিলে কে দেখিতে পায়' ? মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞানযোগে সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতির উপলব্ধি হয়। কিন্তু সৃষ্টি একজন করিলেন, না অনেকে— ঈশ্বর এক কি অনেক—এ কথা পিতা না বলিয়া দিলে আর কেহই বলিতে পারে না। তাঁহার নিয়ম পালন করা ধর্ম্ম। নিয়ম পালন করিলে পুরস্কার হয়, না করিলে দণ্ড হয়, এ কথা স্পষ্টভাবে কে বলিতে পারে ? তিনিই পারেন। পরলোক আছে, সেখানে পাপের দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার হয়, এ কথা আমরা তাঁহার নিকট হইতেই শুনিতে পাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পণ্ডিতেরা পরলোকের বিষয়ে নিশ্চয় মত কিছুই দিতে পারেন

না। সক্রেটিশ নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক পরলোক আছেন বলিয়া আশা করিতেন, কিন্তু পরলোক নাই এ কথায় প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। ইহা কেবল ঈশ্বর প্রমুখাৎ আমরা জানিতে পারিয়াছি। আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি কি ইহা মোটামুটি আমরা সহজ জ্ঞান হইতে জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে তাঁহার প্রতি আমাদিগের কি কর্ত্তব্য, কি বিশেষ প্রথাতে আমরা তাঁহাকে সেবা করিব, ইহা তিনিই আমাদিগকে বলিয়া দেন।

সেই জন্য আমাদিগকে বিশুদ্ধ জ্ঞানে আলোকিত করিবার জন্য, পিতার রাজ্যের পথ পুত্রদিগের নিকট প্রকাশিত করিবার জন্য, তিনি মধ্যে মধ্যে পুত্রভাবে পৃথিবীতে দেখা দেন। ইহার অর্থ নহে যে তিনি মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ অর্থে অবতারবাদ আমরা মানি না। অনন্ত নিরাকার ঈশ্বর অন্তবিশিষ্ট সাকাররূপে কিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন? মনুষ্যেরা ধর্ম্মের পথ সহজ করিবার জন্য ঈশ্বরকে মনুষ্যভাবে কল্পনা করিয়া থাকে। ইহাতে মানুষ দেব পদ পায়, কিন্তু ঈশ্বরকে মনুষ্যত্ব আরোপ করিয়া তাঁহার অনন্তত্বকে বিনাশ করিয়া ফেলে। মানুষ ঈশ্বর হইতে পারে কিম্বা ঈশ্বর মানুষ হইতে পারেন এটি ভয়ানক মিথ্যা কথা। নববিধান এই অবতারবাদকে সমূলে বিনাশ করিতে আসিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে ঈশ্বর যখন দেখেন যে মানুষেরা নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছে, পাপসমূহ আসিয়া

তাহাদিগকে আর অনন্তের দিকে যাইতে দিতেছে না, জড়-পদার্থ আত্মার পক্ষে নিতান্ত ব্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তিনি পুত্রভাব প্রেরণ করিয়া জগতকে সেই পাপভার হইতে, সেই জড়ের আধিপত্য হইতে মুক্ত করেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে তাঁহার পুত্রভাবে জন্মগ্রহণ ইহার অর্থ কি? প্রকৃত ধর্ম্ম বুঝিতে গেলে আত্মা এবং জড় এ দুইটি পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করিয়া লইতে হইবে। ধর্ম্ম আত্মা লইয়া, ভাব লইয়া, চিন্তা লইয়া একজন ধার্ম্মিক লোক আমার সম্মুখে কেবল আত্মা হইয়া প্রকাশিত হন। যখন আমি ঈশা বলিয়া একজন লোককে ভাবি, তখন আমি তাঁহার শরীর কি ছিল তাহা ভাবি না। বাস্তবিক তাঁহার প্রকৃত প্রতিমূর্ত্তি কি তাহা জগত এ পর্য্যন্ত জানে না। যখন ঈশাকে ভাবি তখন তাঁহাকে ঈশ্বরপুত্র বলিয়া ভাবি, ক্ষমা, নির্ভর, প্রেম প্রভৃতি ভাবের প্রকাশ বলিয়া ভাবি। আত্মাই ভাবের আবাস, শরীরভাব সকলের দাস। আমার যেরূপ ভাব হইবে, তাহা শরীর দিয়া সেই ভাবে কার্য্যে পরিণত হইবে। আমার ভিতর দেবভাব হইলে, তাহার পবিত্র দীপ্তি চক্ষুর ভিতর দিয়া বাহির হইবে, হস্তের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইবে। এবং মন্দভাব হইলে শরীর দিয়া তাহার অপরিষ্কার স্রোত নির্গত হইয়া পড়িবে। তবে মন্দভাব হইলে শরীরগত যত কামনা তাহা উত্তেজিত হয় এবং তখন হইতে শরীর মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করে। কিন্তু দেবভাব হইলে, সেই

ভাবের আধিপত্য স্থাপিত হয়, শরীর আত্মার দাস হইয়া থাকে। মনুষ্যের জীবনে চিরকাল আত্মা এবং শরীরের বিবাদ চলিতেছে। এ বলে আমি প্রভুত্ব করিব ও বলে আমি প্রভুত্ব করিব। এমন সময় আসে যে সময় ধর্ম্মালোক অভাবে মানুষেরা সম্পূর্ণ রূপে শরীর, অর্থাৎ শরীরের কামনা সকলের দাস হইয়া পড়ে। আর সে অবস্থায় মনুষ্য যতই কেন চেষ্টা করুক না, কোন প্রকারে সে দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে পারে না। সেই সময়ের জগতের অতিশয় শোচনীয় দুরবস্থা উপস্থিত হয়। মানুষের নিজের বলে কিছুই করিতে পারে না—দেববল না আসিলে তাঁহার কোন প্রকারে উদ্ধার হয় না। ঈদৃশ অবস্থায় দেব পুত্রের জন্ম হয়। ভগবান সেই পুত্রের মনে এমন একটি প্রবল ভাব নিহিত করিয়া দেন যে সে লোক সেই ভাব হইতে কোন কালে নিষ্কৃতি পায় না। সে সেই ভাবকে মন হইতে দূর করিয়া দিতে চেষ্টা করে, তাহা দূর হয় না; ভুলিতে চেষ্টা করে, তাহা ভুলা যায় না; কামনা আসিয়া তাহাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করে, তাহা বশীভূত হয় না। তাঁহার কথায় কার্য্যে সেই ভাব প্রকাশিত হয়। তাহাকে যেন ভূতে পাইয়া ফেলে: সে সেই ভাবকে কোনমতে তাড়াইতে পারে না। সেই ভাবে তাঁহার জন্ম, সেই ভাব লইয়া তাঁহার জীবন, সেই ভাবে তাহার মৃত্যু। জন্ম তাহার দৈব; জীবন দেখিলে আমরা

বিপন্নাপন্ন হই, মৃত্যু দেখিলে জগত সচকিত হইয়া যায়। তাহার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা একটি নূতন শাস্ত্র প্রচার করে, তাহার কথাগুলি বজ্রধ্বনির মত পৃথিবীকে সজাগ করিয়া দেয়। নিদ্রিতাবস্থায় থাকিয়া জগত সেই কথা শুনিয়া চেতনা লাভ করিতে চেষ্টা করে, এবং তাহার পর সেই কথা শুনিয়া জীবনকে ভাল করিতে চেষ্টা করে।

এইরূপ কত সময়ে, কতবার ভগবান পুত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া জগতের উদ্ধার করেন। তিনি নিজে শরীররূপে অবতীর্ণ হন না। কিন্তু তাঁহার একটি ভাব মহাপুরুষের প্রকৃতিতে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন। সেই ভাবটি তাঁহার এবং সেই ভাব আসিয়া পৃথিবীকে, সংসারকে, জড়পদার্থকে, অর্থাৎ কামনাকে বিনাশ করে। তিনি নিজে পুত্র হইয়া অবতীর্ণ হন, ইহার অর্থ এই যে তিনি মনুষ্যদিগের কর্ত্তব্য কি ইহা শিখাইবার জন্য সময়ে সময়ে নিজ ভাবে ভূষিত করিয়া কোন এক মহাপুরুষকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সেই মহাপুরুষ জীবনে মরণে সেই ভাব প্রচার করেন, এবং সেই ভাব দেখিয়া পৃথিবী জাগ্রত হয়।

মহাপুরুষ লইয়া পৃথিবীতে অনেক প্রকার কুসংস্কার জন্মিয়াছে। ঈশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছেন ইহা বলিলেই লোকে বলিবে যে তাঁহার কোন অলৌকিক কার্য্য করা উচিত। এইরূপ কোন সাক্ষ্য না পাইলে পৃথিবীর লোকেরা মহা-

পুরুষকে মানে না। অলৌকিক ঘটনা মানে যদি অনৈসর্গিক কিম্বা অতিপ্রাকৃত হয়, তাহা আমরা মানি না। ভগবান অনন্ত হইয়া ত অন্তবিশিষ্ট হইতে পারেন না। ইহা ছাড়া তিনি আপনার নিয়মও ভঙ্গ করিতে পারেন না। এই বিশ্বে অনেকগুলি শক্তি নিহিত আছে। একটি একটি শক্তির একটি একটি কার্য্য। উত্তাপ, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বক আকর্ষণ, তড়িৎ, রাসায়নিক সংযোগ প্রভৃতি শক্তিগুলির নাম। ঈশ্বর যখন কোন কার্য্য করেন তখন তিনি এই শক্তিগুলি দিয়া নিজ অভিলাষ পূর্ণ করিয়া লন। একটি একটি কার্য্যতে নানা শক্তির প্রয়োগ আবশ্যক। একটি শক্তি দিয়া আর একটি শক্তিকে নিবৃত্তি করেন। যেমন পক্ষী উড়িতে গেলে মাধ্যাকর্ষণ নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই জন্য পক্ষীর ডানা হইয়াছে এবং সেই ডানা ছাতার মত নির্ম্মিত বলিয়া নিম্নের বায়ু পক্ষেতে আসিয়া আঘাত করে এবং সেই আঘাতে পক্ষী উড়ে। উপরকার বায়ু ছাতার চারিদিক দিয়া বহিয়া যায়। পক্ষ সমতল হইলে পক্ষী উড়িতে পারিত না। সুতরাং উপরকার বায়ুর শক্তি নিবৃত্ত করিবার জন্য পক্ষ ছাতার ন্যায় হইয়াছে। নানা শক্তিকে সমন্বয় এবং নিবৃত্তি করিয়া ভগবান একটি একটি কার্য্য করেন। তিনি কখন নিয়ম ভঙ্গ করেন না। যাহা চিরকাল হইয়া আসিয়াছে তাহা তিনি কখন অন্যথা করেন না সুতরাং অতি প্রাকৃত ঘটনার কোন অর্থ নাই। কিন্তু ইহা

নিশ্চয় যে ভগবান নিজ চক্ষে, নিজ হস্তে জগত রক্ষা করিতেছেন। এই জগতে যখন যাহা আবশ্যক হয়, তাহা তিনি যোগাইয়া দিতেছেন। কি প্রকারে যোগাইতেছেন? শক্তি সঞ্চালনা করিয়া শক্তিদিগকে নিবৃত্তি করিয়া। জন সমাজের উপকারার্থ, মনুষ্যের মুক্তির জন্য, তাঁহার প্রকাণ্ড লক্ষ্য পূর্ণ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই বিধান করিতেছেন। সাধারণ বিধান এবং বিশেষ বিধান আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। অনেকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিধান মানিতে কুণ্ঠিত হন। বোধ হয় ধর্ম্মেতে অবতারবাদ এবং অনান্য কুসংস্কার আসে বলিয়া তাঁহারা নববিধান স্বীকার করিতে চান না। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম বিধান অস্বীকার করেন তাঁহারা সামাজিক বিধান, বৈজ্ঞানিক বিধান প্রভৃতি অক্লেশে মানিয়া লন। বাস্তবিক এই সকল বিধানে কোন প্রভেদ নাই। কোপার্নিকাস্, কেপ্‌লার, গেলিলিও, নিউটন, ফ্রাঙ্কলিন এই সকল মহাপুরুষকে ভাবিলে কখন কি দৈব-শক্তিকে অস্বীকার করিতে পারি? তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধি, জ্ঞানের দীপ্তি, আবিষ্ক্রিয়ার শিখা দেখিলে প্রত্যাদেশ, দৈব আলোক না মানিয়া কি থাকা যায়? একটি ফল বৃক্ষ হইতে পতিত হয় ইহা সকলেই দেখিয়াছে এবং দেখিতেছে। কিন্তু নিউটনই এই ফলের পতন হইতে পৃথিবী চন্দ্রের আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই আকর্ষণে আকাশের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্যরাশি নিজ নির্দ্দিষ্ট বর্ত্মের মধ্যে নিবদ্ধ

আছে এ ব্যাপারও অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল মহাপুরুষ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা মনুষ্য সমাজকে অনন্ত উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইয়াছেন, ঈশ্বরের জ্ঞানকে স্পষ্টতর রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছেন, ইহা কে অস্বীকার করিবে? আমরা কি প্রকৃতির মূল তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া ঈশ্বরকে ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই? বিজ্ঞানের দ্বারা ধর্ম্মপথ কতদূর পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে ইহার পরিমাণ কে করিতে পারে? এইরূপে দেখিব যে সমাজ সম্বন্ধে, রাজনীতি সম্বন্ধে, দর্শন সম্বন্ধে এক এক জন মহাপুরুষ মানব সমাজকে অপার কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহা সকলই বিধাতার লীলা। তিনি নিজেই পৃথিবীর ভার বহন করেন এবং পৃথিবীর হিতার্থ বিধান করেন।

যদি এই সকল বিধান মানিতে আমরা সক্ষম হই, তাহা হইলে ধর্ম্ম বিধান মানিবার পক্ষে কি ব্যাঘাত আছে? যেমন জড় জগত অসংখ্য নিয়ম দ্বারা চালিত হইতেছে, তেমনি ধর্ম্মজগতে, মনোজগতে অসংখ্য নিয়ম আছে। আমরা যেমন বলিতে পারি আকাশের কিরূপ অবস্থা থাকিলে ঝড় হইবার সম্ভাবনা থাকে, কি প্রকার অবস্থাতে চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ হয়, কোন্ প্রকার ভূমিতে কোন্ প্রকার বৃক্ষ কিম্বা শস্য হয়, তেমনি আমরা ইতিহাস পাঠ করিয়া বলিতে পারি কোন্ অবস্থাতে দেশে একটি সামাজিক বিপ্লব হইবে, কোন্ সময় একটি মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, এবং কখন্ বা ঈশ্বরের

একটি নূতন ভাব আসিয়া পৃথিবীকে জাগ্রত এবং সচেতন করিবে। যখনই দেখি যে কোন দেশ ভয়ানক দুরাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অহঙ্কার, পাপ, নাস্তিকতা লোকদিগকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই ঠিক সেই পাপগুলি মোচন করিবার জন্য একজন মহাপুরুষ একটি বিধান লইয়া আসেন। এই রূপে রোম এবং গ্রীস দেশে ভয়ঙ্কর অমানুষিক পাপ প্রবল হইলে ঈশা পরিত্রাতা হইয়া আবির্ভূত হন, আরব দেশে পৌত্তলিকতা নষ্ট করিবার জন্য মহম্মদ আসেন; ভারতকে বাহ্যিক ধর্ম্ম-প্রণালী হইতে রক্ষা করিবার জন্য বুদ্ধ প্রেরিত হন এবং বঙ্গদেশকে জ্ঞানাভিমান হইতে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব হয়। কোন বিধানটি আর কোন বিধানের তুল্য নহে। চৈতন্য জেরুসালেম নগরে ধর্ম্ম প্রচার করিলে ইহুদীরা তাঁহাকে উন্মাদ বলিত; ঈশা বিনয় ও নির্ভয় শিক্ষার জন্য মক্কায় জন্ম গ্রহণ করিলে আরবেরা তাঁহাকে যে কি করিত তাহা অনুভব করা যায় না। এবং বুদ্ধ আথেন্‌স্ নগরে নির্ব্বাণ প্রচার করিলে লোকেরা তাঁহাকে মস্তিষ্কহীন মূর্খ বলিয়া উপহাস করিত। ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্ম লইয়া অনেক বিবাদ হইয়া থাকে। সকলেই বলে যে আমাদিগের ধর্ম্মই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই রূপে ধর্ম্মের সহিত ধর্ম্মের তুলনা সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ তুলনা করা মহা ভ্রম। প্রত্যেক রোগের একটি একটি চিকিৎসা আছে। সেই সেই চিকিৎসা গুলি তুলনা করা অতিশয় ভ্রম। তবে

এই বলা যাইতে পারে যে প্রতি ধর্ম্মের ভিতর যেমন একটি বিশেষ দেবভাব সন্নিহিত আছে, তেমনি তাহাতে সেই সময়কার, কিম্বা সেই জাতির বিশেষ বিশেষ ভাবও দৃষ্ট হয়। এবং সেই সময়ঘটিত ভ্রমও দেখা যায়। যেমন খ্রীষ্টান ধর্ম্মে অতিপ্রাকৃতে এবং দানবে বিশ্বসা, বৌদ্ধ ধর্ম্মে পুনর্জন্মে বিশ্বাস, ভারতের ধর্ম্মে সাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস ইত্যাদি। কিন্তু বিধান ইতিহাস পাঠ করিলে আমরা মনুষ্যের ভাব লইব না, কেন না মনুষ্য ভাব লইয়া ধর্ম্ম হয় না। প্রতি বিধানে কোন্‌টি দৈবভাব আছে, সেইটিই আমরা জানিতে চাই। মনুষ্য ভাব ত পৃথিবীর মুক্তি সাধন করে নাই। অতিপ্রাকৃত ঘটনা ও দানবে বিশ্বাস ঈশা সৃষ্টি করেন নাই। এ দুইটি বিশ্বাস তাঁহার অনেক কাল পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত ছিল। সেইরূপ পুনর্জন্ম মত বুদ্ধ সৃষ্টি করেন নাই। ভারতে অনেক কাল হইতে তাহা প্রচলিত ছিল। বুদ্ধের ভিতর ঈশ্বর যে ভাবটি প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন তাহাই দৈব; তাহাই লোকদিগকে মুক্তি দিয়াছিল। অনৈসর্গিক ঘটনা হউক বা না হউক, দানব মানুষের উপর আধিপত্য করুক বা না করুক, ঈশার সন্তানত্ব বিষয়ক কথা অভ্রান্ত এবং স্থির নিশ্চয়। তেমনি পুনর্জন্ম থাকুক বা না থাকুক, নির্ব্বাণ সকল অবস্থাতে, সকল সমাজে, সকল সময়ে মনুষ্যের পরিত্রাণপথের সহায়। আবার ঈশ্বর সাকার হউন বা

নিরাকার হউন, ভক্তি মনুষ্যের এক পরম উপায়। তাহা অনন্ত কাল ব্যাপিয়া সত্য—তাহার কখন অন্যথা হইতে পারে না। সাকার ঈশ্বরবাদ চৈতন্যের সৃষ্টি নহে, তাহা সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া ভারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু ভক্তি, প্রেম ইহা অনন্ত কালের সত্য। ইহা ঈশ্বর প্রেরিত ভাব। অনৈসর্গিকতা এবং দানববাদ ইউরোপকে জাগ্রত করিয়া দেয় নাই। সন্তানত্ব ঐ মহাত্মগুকে উদ্ধার করিয়াছে। পুনর্জন্ম তত্ত্ব শুনিয়া ভারত মুক্তির পথে যাইতে পারে নাই—নির্ব্বাণ শাস্ত্রই দেশকে বাহিক ক্রিয়া কলাপ হইতে বাঁচাইয়াছে। তেমনি সাকারতত্ত্ব বঙ্গদেশকে উদ্ধার করে নাই, ভক্তিতত্ত্বই এই দেশকে নবভাবে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল।

এই একটি একটি দেবভার লইয়া নববিধান। পিতার প্রতি সন্তানের কর্ত্তব্য স্থিরীকরণের জন্য বিধাতা মধ্যে মধ্যে সন্তান-ভাবে প্রকাশিত হন। সন্তান ভাব শিখিবার জন্য আমরা ইতিহাস পাঠ করি। জগতের ইতিহাস সেই জন্য আমাদিগের পক্ষে প্রকাণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্র, কেবল অষ্টাদশ নহে, সহস্র পুরাণ। ইহা পাঠ করিলে পুণ্য হয় এবং ইহাকে যেন আমরা কখন অবজ্ঞা না করি।

বিধাতার তৃতীয় প্রকাশ পবিত্র ভাব রূপে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে এই পবিত্র ভাবকে পবিত্রাত্মা বলে।

পবিত্র ভাব।

আমরা বলিয়াছি যে বিধাতা পিতা হইয়া বিশ্বসৃষ্টি করিয়াছেন এবং পুত্র ভাবে মনুষ্যদিগকে পিতার প্রতি কর্ত্তব্য শিক্ষা দিতেছেন। কিন্তু মহাপুরুষেরা পৃথিবীকে যে ভাব দিয়া চলিয়া যান, পৃথিবীর লোকেরা কি তাহা সহজে বুঝিতে পারে? এমন কতবার হইয়াছে যে একজন মহাপুরুষ অমূল্য সত্য দিয়া পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে বুঝিতে কত কষ্ট হইয়াছে, কত দলাদলি হইয়াছে, কত প্রকারে অশান্তি প্রচার হইয়াছে! নূতন ধর্ম্মের নূতন শাস্ত্র পুস্তক মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু মনুষ্যেরা অক্ষর বুঝিতে গিয়া ভাব বুঝিতে পারে নাই। সমস্ত ধর্ম্মমণ্ডলীরা আপন আপন শাস্ত্রকে অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু সেই সকল শাস্ত্র বুঝিতে কত ভ্রম আসে! পুস্তক অভ্রান্ত হইলেও লোকেরা ভ্রান্ত। সুতরাং অভ্রান্ত মতের কোন ফল হইতেছে না এবং কোন প্রকার উপকারও হইবে না। যদি পুস্তক বুঝিবার সময় লোকে নিজের বুদ্ধি কিম্বা মস্তিষ্ক চালনা করে, তাহা হইলে ঈশ্বরের কথা না পাইয়া সে আপনার কথাই পায়। বাস্তবিক কথা এই যে ভগবানের কথা ভগবানের কাছেই শুনিতে হইবে। এ বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদিগের বুঝা আবশ্যক।

যখন কোন ভক্ত মহাপুরুষ পৃথিবীতে লীলা করেন,

তখন তাঁহার সমুদয় ভাব ঈশ্বরেতে টলিয়া থাকে। তিনি কায়মনোবাক্যে কেবল বিধাতার সেবায় নিযুক্ত থাকেন। তাঁহার কিছুমাত্র স্বার্থ থাকে না। তাঁহার না থাকে ঘর, না থাকে বাড়ী, না থাকে আত্মীয়সজন, না থাকে ঐশ্বর্য্য, না থাকে প্রতিপত্তি। তাঁহার সর্ব্বস্বধন ঈশ্বর। ঈশ্বর ছাড়া তিনি আর কিছুই জানেন না। ঈশ্বর তাঁহার পিতা, মাতা, বন্ধু, গুরু, সহায় সম্পত্তি। তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ যখন লোক যখন কোন কার্য্য করেন, কি কথা বলেন, তখন তিনি আপনার কার্য্য কিছুই করেন না, আপনার কথা কিছুই বলেন না। তিনি সেই বিধাতারই কার্য্য করেন, সেই বিধাতারই কথা বলেন। সুতরাং তাঁহার কার্য্য, তাঁহার কথা বিধাতার দিক হইতেই বুঝিতে হইবে। আমরা আপনার বুদ্ধির দিক হইতে দেখিলে তাহা কিছুই বুঝিতে পারিব না। মনে কর আমি একদিকে দাঁড়াইয়া একটি পাহাড় দেখিতেছি, আর একজন আর একদিক হইতে সেই পাহাড়টি দেখিতেছে। আমি বলিতেছি যে পাহাড়ের উপর অনেক গাছ পালা আছে, আর একজন বলিতেছে,—কৈ না, আমি ত কেবল বিচ্ছিন্ন প্রস্তর খণ্ড দেখিতেছি। এখন সেই জন যদি গাছ পালা দেখিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে আমার দিকে আসিতে হইবে। না আসিলে সে আমি যাহা দেখিতেছি তাহা দেখিতে পাইবে না। ঠিক সেইরূপ আমরা মহাপুরুষেরা যাহা দেখিতেছেন তাহা

দেখিতে পাই না। তাঁহাদিগের দিকে না গেলে তাঁহারা যাহা দেখিতে পান আমরা তাহা দেখিতে পাইব না। তাঁহারা সর্ব্বস্ব দিয়া ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবান ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না, ভগবানের কথা ছাড়া আর কিছু কথা শুনিতে পান না। তাঁহাদিগের চক্ষু কর্ণ পরিষ্কার। কিন্তু আমরা আপনাকে দেখি, আপনার কথা শুনি। আমাদিগের দিক হইতে আমরা কিরূপে সেই ঈশ্বরের মুখ দেখিব, তাঁহার কথা শুনিব? সেই জন্য মহাপুরুষকে বুঝিতে হইলে, তাঁহার দিকে যাইতে হইবে। তাঁহার দিকে গেলে তবে আমরা তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব।

এখন তাঁহার দিকে যাওয়ার অর্থ কি? ইহার অর্থ কি আমরা সকলে এক এক জন মহাপুরুষ হইব? না। যে ভাবে মহাপুরুষ ভাবান্বিত, আমাদের সেই ভাব হওয়া উচিত। পুত্র ভাব দেখিলে আমরা দেখিতে পারি যে মহাপুরুষদিগের অহঙ্কার অর্থাৎ অহং এই জ্ঞানটি নাই। তাহা কেমন করিয়াই বা থাকিবে? যিনি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিয়া ঈশ্বরেতে আত্মসমর্পণ কবিয়াছেন, তাহার অহং কোথায় থাকিবে? তাহার কি অহং থাকিতে পারে? তিনি কি কখন বলিতে পারেন আমি এই কার্য্যটি করিতেছি, আমি বলিতেছি, আমি শুনিতেছি, ইত্যাদি? হায়! তাঁহার যে "আমি" রূপ পক্ষীটি উড়িয়া গিয়াছে। তিনি যে ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া

কেবল "তুমি" "তোমার" বলেন। এখন আমি যদি মহাপুরুষকে বুঝিতে চাই, তাহা হইলে আমারও অহং ভাবটি যাওয়া চাই। আমাকে সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিনয়-ভূষণে অলঙ্কৃত হইতে হইবে। দ্বিতীয় কথা এই যে মহাপুরুষ-দিগের স্বার্থ নাই। তাঁহারা যখন আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের আপনার বলিবার কিছুই নাই। আমার পুত্র, আমার পরিবার, আমার ধন, এ সকল কথা মহাপুরুষদিগের অভিধানে নাই। তাঁহারা ঈশ্বরের ভৃত্য হইয়া, ভাবের দাস হইয়া, জীবনকে সেই ঈশ্বরের নিকট, সেই ভাবের নিকট বিক্রয় করিয়াছেন। সেই ভাবের জন্য তাঁহারা জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে বুঝিতে গেলে আমাদিগকেও নিস্বার্থ হইতে হইবে। যাঁহারা আপনাকে ছাড়িয়া ঈশ্বরের হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে গেলে আমাকেও আপনাকে ছাড়িতে হইবে। অতএব মহাপুরুষ-দিগকে বুঝিতে গেলে আমাদিগের হৃদয়ের একটি বিশেষ অবস্থা হওয়া উচিত। আমাদিগকে প্রথমতঃ নিরহঙ্কারী, দ্বিতীয়তঃ নিস্বার্থ হইতে হইবে।

এরূপ অবস্থা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে ঈশ্বরের ভাব আমাদিগের হৃদয়ে অবতীর্ণ হইবে। আমাদিগের মন হইতে অন্ধকার দূর হইলে তাঁহার আলোক আসিয়া সকল সত্য, সকল শাস্ত্র উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত করিবে। এই যে দেব-ভাব ইহা তখন আমাদিগের সহায় হইবে। মহাপুরুষদিগের

প্রচারিত সত্য আমরা তখন ইহার সাহায্যে বুঝিতে পারিব। পৃথিবীতে কত সময়ে এইরূপ লোকদিগের মন অকস্মাৎ আলোকিত হইয়া, দেবভাবে উত্তেজিত হইয়া নূতন সত্য বুঝিতে পারিয়াছে এবং বুঝিতে পারিয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে।

এই ভাবকে প্রত্যাদেশ বলে। সহজ কথা এই যে মনুষ্য নিজবলে ঈশ্বরের কথা বুঝিতে পারে না। তিনি দয়া করিয়া না বুঝাইলে তাঁহাকে বুঝিতে পারা আমাদিগের সাধ্যাতীত। তিনি পুত্রভাবে প্রকাশিত হইয়া মনুষ্য আত্মাকে সহসা জাগ্রত করিয়াছেন, তাহার পর আবার পবিত্রাত্মা ভাবে প্রকাশিত হইয়া এমন এক নূতন বেগ সঞ্চালিত করেন, এমন এক ভাবের তরঙ্গ উঠান যে তাহাতে জন সমাজ ব্যথিত হইয়া একেবারে স্বর্গের দিগে উঠিতে থাকে। নিম্নে একটী ত্রিকোণ আকার দিয়া এই ভাবটি বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি :—
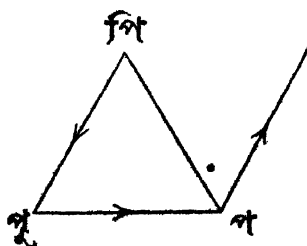
দেখ, উপরে পিতা বসিয়া আছেন। নিম্নে পৃথিবী। পিতা উপর হইতে তাঁহার একটি প্রকাণ্ডভাব শক্তিরূপে প্রেরণ

করিলেন। সেই শক্তিটি পৃথিবীতে আসিয়া একটী পুত্রের জীবনে প্রবিষ্ট হইল। পুত্র মনুষ্যসমাজে এমন একটি ধাক্কা দিলেন যে পৃথিবী পু হইতে প'র দিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু পৃথিবীকে উর্দ্ধদিকে লইয়া যাইবার ক্ষমতা পুত্রের নাই। তখন পবিত্রাত্মা আসিয়া পৃথিবীকে এক ধাক্কা দিলেন। এখন, দেখ, পৃথিবী প'র স্থানে আসিয়াছে। একদিকে পুত্র শক্তি সঞ্চালনা করিতেছেন, আর একদিকে পবিত্রাত্মা। ধর্ম্ম বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী পৃথিবী দুই শক্তির মধ্যভাগ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। অতএব, দেখ, প পি'র দিকে যাইতেছে। বাস্তবিক পৃথিবী পিতার নিকট গিয়া বিশ্রাম পাইল।

এখানে চিরকাল এই লীলার অভিনয় হইতেছে। পিতাই পুত্রকে পাঠাইতেছেন, আবার সেই পুত্রকে বুঝাইবার জন্য তিনিই পবিত্রাত্মা হইয়া আমাদিগকে স্বর্গে লইয়া যাইতেছেন। দেখ, মানবজাতির ভাবনা কিসে। দয়াল পরমেশ্বর পিতা হইয়া সৃষ্টি হইতে "আমি আছি" এই রব দিনরাত্রি উঠাইতেছেন; তিনিই আবার পুত্র হইয়া আমাদিগের বিবেককে জাগ্রত করিতেছেন; তিনিই আমাদিগের অজ্ঞতা, আলস্য দূর করিবার জন্য পবিত্রাত্মা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার দিকে লইয়া যাইতেছেন। আমরা যদি বিপদে পড়িয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হই, শাস্ত্রালোচনা করিয়া কোন্ পথ দিয়া যাইব ঠিক করিতে না পারি, কঠিন ব্রত লইয়া তাহা সম্পন্ন করিতে না পারি, যদি আলোকাভাবে পথ দেখিতে না পাই, তাহা হইলে কায়মনো-

বাক্যে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন। তখন দেখি বিপদ কোথা হইতে চলিয়া যায়, বিবেক হঠাৎ প্রস্ফুটিত হয়, দুঃসাধ্য সাধ্য হয়, এবং জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। প্রত্যাদেশের নিয়ম কেবল একটি মাত্র। বিধিপূর্ব্বক অহঙ্কারবর্জ্জিত হইয়া তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করা। কাম থাকিলে, ক্রোধ থাকিলে, লোভ থাকিলে, মোহ থাকিলে, হিংসা থাকিলে, অহঙ্কার থাকিলে, মুখ হইতে দয়ার প্রার্থনা বহির্গত হয় না। সেই জন্য অনেক সময় প্রার্থনা করিয়াও আমাদিগের মনস্কাম চরিতার্থ হয় না। ভগবান পরিষ্কার গৃহ ভাল বাসেন। অপরিষ্কার, দুর্গন্ধময়, কর্দ্দমময় স্থানে তিনি আসেন না। সেই জন্য যে মন অপবিত্র তাহা হইতে শত সহস্র প্রার্থনা উঠিলেও তাহাতে ঈশ্বর আবির্ভূত হন না। তিনি যখন দেখেন যে হৃদয় অহংজ্ঞান বর্জ্জিত হইয়াছে, এবং অহং পদার্থের দুর্গন্ধ সেখানে নাই, তখন তিনি পবিত্রাত্মা হইয়া সেই মনকে ঊর্দ্ধদিকে, পিতৃভবনে লইয়া যান। প্রত্যাদেশকে কেহ যেন ছেলেখেলা মনে না করেন। ইহা সাধনের পক্ষে সর্ব্বোচ্চ অবস্থা। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থত্যাগ না করিলে পূর্ণ প্রত্যাদেশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। ঈশা বলিয়াছেন যে দীনাত্মারাই স্বর্গরাজ্যের অধিকারী। ইহার অর্থ এই যে মনুষ্যদিগকে বাস্তবিক দীন হইতে হইবে। তাহাদিগের ধন-গর্ব্ব থাকিবে না, বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা, ধর্ম্ম এ সকল বিষয়ে অহঙ্কার একেবারে থাকিবে না। তাহারা মনে করিবে, যে

আমাদিগের কেহ নাই, কিছুই নাই, আমরা সম্পূর্ণরূপে অসহায়, নিরাশ্রয়, বন্ধুহীন, অনাথ। এইরূপ দীনভাব হইলে তবে ভগবান সেই হৃদয়ে প্রত্যাদেশ দান করিয়া থাকেন।

কেহ কেহ বলিবেন প্রত্যাদেশ ত উচ্চ সাধনের অবস্থা। তবে কি পাপীদিগের কোন গতি নাই? আমি বলি যে পাপীদিগের জন্যই ত বিধান। বিধাতা পাপীদিগকে উদ্ধার করিবেন বলিয়াই ত বিধান প্রেরণ করেন। পুণ্যবান লোকেরা ত ভগবানের কাছে আছেন। পাপীরা তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন, সেইজন্য পাপীদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য বিধান প্রেরিত হয়। তিনি পাপী তরাইবার জন্য পুত্রকে পাঠান। পুত্র নিজ জীবন দেখাইয়া পাপীদিগকে ধর্ম্মের পথে আনেন। তিনি তাহাদিগের বিবেককে জাগ্রত করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুল করেন। যত দিন তিনি পৃথিবীতে থাকেন ততদিন তাহারা তাঁহার ভাবে নিমগ্ন থাকে। কিন্তু তিনি তিরোহিত হইলে তাহাদিগের প্রকৃত দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। তখন কে তাহাদিগকে আর সেরূপ কথা বলিবে? কে আর তাহাদিগকে নূতন বল দিবে? কাহার মুখে আর ভগবানের মুখের আভাস পাইবে? তখন তাঁহারা বাস্তবিক দুর্ব্বল, অসহায়, দরিদ্র এবং দীন হইয়া পড়েন, এবং তখনই তাঁহাদিগের হৃদয়ে পবিত্রাত্মার সঞ্চার হয়। আমরা ধর্ম্ম ইতিহাস পড়িয়া দেখিয়াছি যে কোন মহাপুরুষের স্বর্গারোহণের পর

তাঁহার শিষ্যেরা এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয় বলিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে পবিত্রাত্মার শুভ আগমন হয়। তখন তাহারা নূতন বল পায়, নূতন কথা বলে, নূতন ভাবে জীবনকে রঞ্জিত করে। তখন তাহারা নবজীবন পাইয়া মহাপুরুষের ধর্ম্মকে দশগুণ প্রবল করাইয়া দেয়। সকল ধর্ম্মবিস্তারের আখ্যায়িকা এই এক প্রকারের। পুত্র জন্মাইলেন, তিনি কতিপয় শিষ্য গঠন করেন। তাহার পর পবিত্রাত্মা আসিয়া সেই শিষ্য-দিগকে নব অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া পৃথিবীর সকল স্থানে পাঠান, এবং সেই পবিত্রাত্মার প্রভাবে প্রত্যেক শিষ্য প্রভুর ন্যায় হইয়া তাঁহার রাজ্য বিস্তার করেন।

এখন বল দেখি যে, শিষ্যেরা পবিত্রাত্মার বশীভূত এত শীঘ্র হন কেন? এই জন্য যে শিষ্যেরা অতিশয় ব্যাকুল থাকে। তাহারা আপনাদিগকে সত্য সত্য অসহায় মনে করে। তাহারা ভাবে যে, তাহাদিগের তখন জগতে আর কেহ নাই। এই অবস্থায় তাহারা দিন রাত্রি কাঁদে এবং বিধাতাও তখন দয়া করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে পবিত্রাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন। এই পবিত্রাত্মা প্রকাশ হইবারও নিয়ম এই যে লোকেরা দীনাত্মা হইবে। দীনাত্মা হইলেই মুখ হইতে সরল প্রার্থনা নির্গত হয়, এবং সরল প্রার্থনা হই-লেই বিধাতা তাহা শ্রবণ করেন। যেখানে অসরলতা থাকে সেখানে ভগবান প্রার্থনা শুনেন না; সেখানে পবিত্রাত্মার প্রকাশও হয় না এবং প্রত্যাদেশও হয় না। সকলের নিয়ম

এক—সরলতা। আমরা এরূপ অনেক পাপীর কথা শুনিতে পাই যে পাপ করিতে করিতে তাহাদিগের ক্রমাগত অধোগতি হইতেছে। হঠাৎ কোন বিশেষ অবস্থাতে পড়িয়া তাহাদিগের চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পড়িল। সেই অশ্রুপাত তাহাদিগের প্রথম সরল প্রার্থনা। তাহাদিগের মুক্তি সেই মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ। জগাই মাধাইয়ের পরিত্রাণ এইরূপে বোধগম্য হয়। প্রার্থনার নিয়ম সরলতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা পাপী বলিয়া অনবরতঃ পরমেশ্বরের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা করা উচিত। অনেকে প্রার্থনা করিতে করিতে অবশেষে কোন প্রকার ফল পায় না বলিয়া নিরাশ ভাবে প্রার্থনার উপর অবিশ্বাস করে। তাহাদিগের ইহা জানা উচিত যে তাহারা সরলরূপে প্রার্থনা করে না বলিয়াই প্রার্থনার অনুরূপ ফল পায় না। এই জন্য আমাদিগের সর্ব্বদা সরল হইতে চেষ্টা করা উচিত। আমরা পাপী—এইটি সর্ব্বদা ভাবা উচিত। আমরা কত নিম্নতলে পড়িয়া আছি, আমাদিগের কত ভাল হওয়া উচিত—এই চিন্তায় মনকে সদা নিযুক্ত রাখা উচিত। এইরূপ ভাবিলে মনে আপনাপনি পাপের গুরুত্ব আসিবে। পাপের অস্তিত্ব যত দিন মনে থাকিবে, তত দিন প্রার্থনা করিব এবং যত আমি পাপী ইহা মনে করিব, ততই প্রার্থনা সরল হইবার সম্ভাবনা হয়। একবার একটি সরল কথা মুখ হইতে নির্গত হইলেই আমাদিগের পরিত্রাণের সূত্রপাত হয়। সে মুহূর্ত্ত কখন আসিবে

জানি না, সে দিন কবে হইবে জানি না। কিন্তু আসিবে যে তাহার কোন সন্দেহ নাই। প্রত্যহ প্রার্থনা করিলে মন ধর্ম্মের দিকে টলিয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থাতেই পরিত্রাণ আসে।

যাঁহারা বলেন যে ভগবান্ নিয়মাধীন দ্বারা এবং সেই জন্য তিনি প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারেন না, তাহাদিগের কথা আমরা শুনি না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বিশ্ব-সংসারে সমুদয় ঘটনা শক্তির সঞ্চালনে ঘটিতেছে। যেমন জড় জগতের বিবিধ নিয়মাবলি, তেমনি আধ্যাত্মিক জগতে সুন্দর নিয়মপ্রণালী বর্ত্তমান। সেই নিয়মগুলি কি, তাহা আমাদিগের আবিষ্কার করা উচিত। ধর্ম্মজীবনের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা তাহা স্থিরীকৃত করিতে পারিয়াছি। মনুষ্যের মন দুর্ব্বল, ইহা সবল হইতে চায়। ঈশ্বরের বল পাইলেই, তাঁহার ভাব পাইলেই আত্মা সবল হয়। সুতরাং আমরা স্বভাবতঃ তাঁহারই নিকটে উপস্থিত হই। তাঁহাকে তখন বলি—ভগবন, আমাকে ভাল কর, আমাকে এই পাপ হইতে উদ্ধার কর। যদি সরলভাবে এই কথা বলি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ইহা শুনেন। কিন্তু তিনি কি প্রার্থনা পূর্ণ করাতে কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন? না। যদি আমরা তাঁহাকে সাংসারিক সুখের জন্য প্রার্থনা করিতাম, কোন রোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কিম্বা আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রার্থনা করিতাম, তাহা হইলে তাঁহাকে জড়

জগতের নিয়ম ভাঙ্গিতে হইত। কিন্তু আধ্যাত্মিক জগত জড়জগত নহে। আমি যখন বলি যে আমার মন হইতে কামপ্রবৃত্তি দূর করিয়া দেও, তাঁহাতে কোন জড়-জগতের নিয়ম ভঙ্গ হয় না। আমার মন ভাল করিবার প্রার্থনা করিতেছি। তিনি সেই প্রার্থনা কিরূপে তবে পূর্ণ করেন? নিয়ম দিয়া তিনি শুনেন—নিয়মভঙ্গ না করিয়া। মনে কর আমি ব্যভিচার মানসে কোন কুসংসর্গে যাইব মনে করিয়াছি। তাহার অগ্রে যদি পাপভারে আক্রান্ত হইয়া আমি পাপ হইতে রক্ষা হেতু তাঁহাকে ডাকিয়া থাকি, তিনি হয়ত ঠিক সেই সময় এমন একটি ব্যাঘাত জন্মাইয়া দিবেন যে আমার আর সেই কুসংসর্গে যাওয়া হইল না। হঠাৎ একখানি পুস্তক হাতে আসিয়া পড়িতে পারে যাহা পড়িয়া আমার মনে অনুতাপ আসিল কি কোন বন্ধু আসিলেন যিনি আমাকে অন্য দিকে লইয়া গেলেন। কর্তৃরূপে কত ভাবে ভগবান শক্তি সঞ্চালন করিতে পারেন তাহা কি আমরা ভাবিতে পারি? তিনি এক শক্তি দিয়া অন্য শক্তিকে নিবৃত্ত করিয়া আপন মানস সাধন করিয়া লন। বিশ্বের সমুদয় নিয়মই তাঁহারই। তিনি সেই সকল নিয়মের দ্বারাই বহির্জগতে এবং অন্তর্জগতে কার্য্য করেন। জড় পদার্থের মন নাই, সুতরাং জড়পদার্থে এক প্রণালী চলিতেছে। কিন্তু মানুষের মন জড় নহে—ইহা স্বাধীন। যাহা মনে করে তাহাই করে। ইহার অবস্থা ইচ্ছাধীন—তাহার সংখ্যা গণনা করা যায় না এবং সেই সকল

অবস্থাতে কিরূপ ফল উৎপন্ন তাহাও ঠিক করা যায় না। অথচ যে মন এত স্বাধীন তাহাই আবার অতিশয় দুর্ব্বল। নিজে যে সকল অবস্থা এবং দায়িত্ব সৃষ্টি করে তাহা নিজেই বহিতে পারে না। কেহ পৃথিবীপতি হইতে চায়, কেহ যোগী হইতে চায়, কেহ বিদ্যালাভে প্রয়াসী, কেহ ধনলাভে যত্নবান্। সকল অবস্থায় দায়িত্ব ভিন্ন ভিন্ন, এবং সকল অবস্থাতে পরীক্ষা যথেষ্ট। এই সকল অবস্থা বিশেষরূপে ভয়াবহ হইলেই মন স্বভাবতঃ ভগবানের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে, এবং যদি তাহার আকাঙ্ক্ষা সরল হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ভগবান তাহা পূর্ণ করেন।

যাহা বলা হইল তাহা হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে, একটি প্রার্থনা পূর্ণ হইলেই আমাদিগের পক্ষে মুক্তির পথ খুলিয়া গেল। সেই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াতে বিধাতার পবিত্রাত্মা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা হইল, এবং পবিত্রাত্মা আবির্ভূত হইলে প্রত্যাদেশের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

নববিধান পবিত্রাত্মা অনুভব করিবার এবং প্রত্যাদেশ পাইবার অধিকার দিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম আমাদিগের প্রত্যেককে করা উচিত। অন্যান্য ধর্ম্মে অশিক্ষিত মানব মহাপুরুষের কথা বুঝিতে পারেন বলিয়া এক জন মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করে। সে জানে যে তাহার ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা নাই। সংসারধর্ম্ম পালন

করিয়া তাহার মন মোহরাশিতে আবৃত আছে। তাহার বুদ্ধিতে তাহাকে বলিয়া দেয় যে সেই অবস্থাতে তাহার হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রকাশ হয় নাই। এই জন্য ধর্ম্মটা সহজ করিবার জন্য সে সম্মুখে এক মধ্যবর্ত্তী স্থাপন করে। সেই মধ্যবর্ত্তী দিয়া তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হয়, সেই মধ্যবর্ত্তী দিয়া তাহার পরীক্ষা বিপদের মীমাংসা হয়। ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হওয়া এত কঠিন স্থিরীকৃত হইয়াছে যে লোকে তাঁহার কাছে যাওয়া অল্পবুদ্ধি কিম্বা অপার সাহসের কথা বলিয়া মনে করে। কোন কোন ধর্ম্মে ইহাও বলে যে ঈশ্বরকে দেখা যায় না। সেই নির্গুণ ঈশ্বরবাদ আসিয়া তাহার ঈশ্বর দর্শনবাদ এককালে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করে। তাহারা বলে যে অনন্ত, সম্পূর্ণ ঈশ্বর অন্তের বহির্ভূত। আমরা যেরূপে তাঁহাকে ভাবিতে যাই আমাদের অন্তবিশিষ্ট স্বভাব তাঁহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে। যে গুণ আরোপ করি, তাহা অন্তবিশিষ্টের, মানবীয় গুণ হইয়া পড়ে। যাঁহার কোন সীমা নাই তাঁহাকে আমাদিগের সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে গেলেই তাঁহাতে একটি সীমা আরোপিত হয়। যদি বলি তিনি দয়াবান, সে দয়া আমরা যে ক্ষুদ্র দয়া বুঝি তাহাই। যদি বলি তিনি অনন্ত, সে অনন্ত কল্পনা করিতে করিতেই তাঁহাকে একটি স্থান দিয়া ফেলি। ঈশ্বর ভাবিতে ভাবিতে আমাদিগের হস্তে মনুষ্য হইয়া পড়েন। এই জন্য আমাদিগের দেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বর মানবীয়স্বভাবযুক্ত বলিয়া অঙ্কিত হন। তাঁহার গুণ বলিতে বলিতে তাঁহাতে

দোষও আসিয়া পড়ে। অবশেষে ঈশ্বর মানুষের মত দোষে গুণে মিশ্রিত হইয়া একটি অদ্ভুত, অস্বাভাবিক প্রতিমূর্ত্তিতে পরিণত হন। ঈশ্বরের রাগ আছে, পক্ষপাতীতা আছে, কোন কোন শাস্ত্রে তাঁহার কাম আছে; ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং এমনি ব্যাপারটী হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা আমাদিগের পক্ষে তাহা সহজ নহে। সেই জন্য অনেক খ্রীষ্টান ধর্ম্মযাজকেরা বলেন যে ঈশ্বরকে মানবে দেখিতে পায় না, ভাবিতে পারে না। সেই ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত কেবল এক মধ্যবর্ত্তীর ভিতর দিয়া হইতে পারে। সেই মধ্যবর্ত্তী ঈশা। তিনি ঈশ্বর হইয়া মানুষ হইয়াছিলেন এই জন্য যে জগৎবাসীরা মানুষের দেবস্বভাব দিয়া ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিবে। ইহা ব্যতীত আমাদিগের আশা ভরসা আর কিছুই নাই। যদি পরিত্রাণ কামনা করি তাহা হইলে ঈশাকে মধ্যবর্ত্তী রূপে বিশ্বাস করিতে হইবে।

এই মতটি এক প্রকার ঈশ্বরকে মানবের অতীত করিয়া ফেলিতেছে। ইহাতে যে ধর্ম্মের কি সর্ব্বনাশ হইতেছে ইহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখিতেছেন না। ঈশ্বরকে যত মানবের অতীত করিয়া প্রমাণ করিব তত তাঁহার অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। নাস্তিকেরা এই কথা বলিতেছে, ঈশ্বরবিশ্বাসীরাও তাহাই বলে; কেবল প্রভেদ এই যে ঈশ্বরবিশ্বাসীরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব একটি দেবমনুষ্যের জীবনের উপর

স্থাপিত করিয়াছেন। সেই দেবমনুষ্যকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করা চাই। তিনি অলৌকিক, অনৈসর্গিক কার্য্য করিতে পারেন বলিয়া আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। তাঁহার ভূত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি আছে। তিনি অনন্ত পুণ্য শরীরের মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন ইহাও বিশ্বাস করা আবশ্যক। অবশেষে তিনি মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের নিকট পাপী পুণ্যবানদিগের বিচার করিতেছেন। এত গুলি মত বিশ্বাস করিলে তবে ঈশ্বর রক্ষা পনি। কিন্তু কথা হইতেছে যে যদি কেহ এ সকল মত বিশ্বাস না করিতে চান ? তাহা হইলে ত ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা হয় না ? বিজ্ঞানের দিন দিন যেরূপ প্রাদুর্ভাব হইতেছে তাহাতে অতি প্রাকৃত ঘটনা সকল বিশ্বাস করা যায় না। এমন অতি প্রাকৃত ঘটনা বিশ্বাস না করিলে খ্রীষ্টানদিগের পক্ষে ঈশার ঈশ্বরত্ব অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের যে অন্যান্য স্বরূপ সকল তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে তাহাও দুর্গম্য হইয়া উঠিতেছে। বল পূর্ব্বক কোন মত সংস্থাপন করার এই অসুবিধা। এতগুলি সিঁড়ির ধাপ দিয়া না উঠিলে আমরা ঈশ্বরের সমাচার কিছুই পাইতেছি না। অনেকে সেই জন্য বিজ্ঞানের উন্নতিকে এত ভয় করে। যেহেতু বিজ্ঞান যত অগ্রসর হইবে ততত ঈশ্বরও লোপ হইতে থাকিবেন।

আমরা বিজ্ঞানকে ভয় করি না। কেমনা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে বিজ্ঞান আমাদিগের নিকট পিতাকে প্রচার করে।

আমাদিগের বিশ্বাস যে ঈশ্বর সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মনে এক বিষম ভ্রম আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহারা বলেন যে আমরা ঈশ্বরকে আয়ত্ত করিতে পারি না। আয়ত্ত করিতে পারি না ইহা ঠিক। কিন্তু আমাদিগের মন তাঁহাকে ধরিতে পারে। সমুদ্র আমাদিগের পক্ষে এক প্রকার অনন্ত। আমরা তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারি না, কিন্তু আমরা কি সেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে পারি না। তাহাতে অঙ্গ নিমগ্ন করিয়া চারিদিকে অপার সমুদ্র বিস্তৃত রহিয়াছে, ইহা কি উপলব্ধি করি না? আকাশ আমাদিগের নিকট আয়ত্তিশীল নহে। কিন্তু আমরা কি আকাশের শেষ অনুভব করিতে পারি? যতই কেন ভাব না, আকাশের শেষ নাই। যদি মনে করি একটি দেওয়াল নির্ম্মিত আছে তাহাই আকাশের সীমা। তাহাও ভাবিতে পারি না, কেন না দেওয়ালকে অতিক্রম করিয়াও আকাশ চলিয়া যায়। কালের আরম্ভ কিম্বা শেষ কে উপলব্ধি করিতে পারে? আমাদিগের চারিদিকে অনন্ত। অনন্তের মধ্যে আমরা অবস্থিতি করিতেছি। যে কোন গুণ ভাবি না তাহার সীমা ভাবিতে পারি না। আমাদিগকে মধ্যবিন্দু করিয়া ভাবিলে তাহা হইতে যতগুলি গুণ নিক্ষেপ করি না কেন সকলই অনন্তে গিয়া পেঁছায়। আবার অনন্তের যত গুণ আছে তাহারা সকলেই সেই মধ্যবিন্দুতে আসিয়া আঘাত করে।
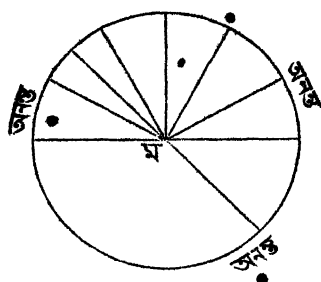
মনে কর মনুষ্য মধ্যে "ম" হইয়া আছে। এই মধ্যবিন্দু হইতে দয়া, শক্তি, জ্ঞান, পুণ্য প্রভৃতি মনুষ্যের যত গুণ আছে ইহারা চারি দিকে চক্রের নেমিরূপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই সকল গুণের অন্ত কি ভাবা যায়? নেমি বিস্তৃত কর, যতদূর লইয়া যাও, দয়া, পুণ্য, শক্তি, জ্ঞান আরও চলিয়া যাইতেছে। অবশেষে মনে কর যে সকল গুণ অনন্তে গিয়া পৌছিল। অনন্ত একটি গোলাকাররূপে এখানে চিত্রিত হইল। মানুষের সঙ্গে এখন অনন্তের সম্বন্ধ কি তাহা বুঝা যায়। ভগবানের প্রত্যেক স্বরূপের অনুরূপ একটি স্বরূপ মনুষ্যের আছে, এবং মনুষ্যের প্রত্যেক স্বরূপের অনুরূপ একটি স্বরূপ ভগবানে আছে। ভগবানের প্রত্যেক স্বরূপ তাহার অনুরূপ মানুষিক স্বরূপকে আকর্ষণ করে, এবং মানুষিক প্রত্যেক স্বরূপ ভগবানের স্বরূপের দিকে প্রধাবিত হয়। মনুষ্যের দয়া, জ্ঞান, পুণ্য, শক্তি অনন্তের দিকে লইয়া গেলেই আমরা অনন্ত দয়া, জ্ঞান, পুণ্য এবং শক্তিকে ধরিতে পাই,

এবং যখন দেখি যে আমাদিগের দয়া, জ্ঞান, পুণ্য এবং শান্তির উন্নতির শেষ নাই, তখন আমরা আমাদিগের প্রত্যেকের অনন্ত জীবন বিশ্বাস না করিয়া থাকিতে পারি না। উন্নতির শেষ আমরা কল্পনা করিতে পারি না। আমাদিগের আত্মার উন্নতি করিবার ক্ষমতা কোথায় শেষ হয় আমরা অনুভব করিতে পারি না সেই মধ্যবিন্দু হইতে গুণগুলি টানিয়া লইয়া যাও—অনন্তকাল পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার বিশ্রাম নাই। সুতরাং মনুষ্য জীবনেই, মনুষ্যের আত্মার ভিতরেই অনন্ত অনুভব করিবার ক্ষমতা নিহিত আছে।"

যদি তাহাই হইল তাহা হইলে আমরা অনন্তকে ধরিতে পারিব না কেন? অনন্তের ভাব চারিদিক হইতে আমাদিগকে চাপিয়া ধরিতেছে। আমরা যেরূপে সেই অনন্তকে ঝাড়িয়া ফেলিতে চেষ্টা করি না কেন, অনন্তের হাত হইতে আমরা রক্ষা পাই না। অতিশয় অসভ্য জাতিদিগের ভিতরেও অনন্ত ভাবের উপলব্ধি আছে। কেহ কেহ বলিবেন যে তাহা কেমন করিয়া সম্ভব, যখন দেখিতেছি যে অসভ্যজাতিরা সাকার কতকগুলি প্রস্তর দেবতা বলিয়া মানে। প্রস্তরকে তাহারা মানুক না কেন? তাহাদিগের বিশ্বাস যে সেই প্রস্তরের যে ক্ষমতা তাহা তাহাদিগের ক্ষমতা হইতে অধিক, সুতরাং তাহাদিগের পক্ষে সেই প্রস্তর অনন্তভাব ধারণ করিয়া আছে। একজন অসভ্য তাহার গ্রামকেই পৃথিবী বলিয়া জানে এবং তাহার দেবতা সেই পৃথিবীর অতীত দেবতা।

একজন সুশিক্ষিত সভ্য এই পৃথিবী, গ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য সকলই দেখিতেছে এবং তাহার অনন্তভাব এই বিশ্বের অতীত। সভ্য এবং অসভ্যে কেবলমাত্র পরিমাণের প্রভেদ। একের অনন্তভাব গ্রামের বহির্ভাগে, অপরের অনন্তভাব সৌর নক্ষত্র জগতের বহির্ভাগে। কিন্তু তাহার পর দুয়েরই অনন্ত সমান। মানুষ, সভ্য বা অসভ্য, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, সকলই অনন্তভাব ধরিতে সক্ষম।

যদি এ কথা সত্য হয় তাহা হইলে আমাদিগের সকলেরই অনন্তের নিকট গমনের অধিকার আছে। অনন্ত যখন চারিদিক হইতে দয়া, জ্ঞান, শক্তি, পুণ্য দিয়া টানিতেছেন, তখন তাঁহার সহিত আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ আছে। তিনি পিতা, মাতা, বন্ধু, রক্ষক, গুরু, সহায় হইয়া আমাদিগের সহিত সকল প্রকার যোগ স্থাপন করিতেছেন। আমরা হৃদয়কে প্রকৃতিস্থ করিলেই এই সকল সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারি এবং এই সকল সম্বন্ধ রক্ষা করিয়াই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারি। তজ্জন্য আমাদিগের মধ্যবর্ত্তী আবশ্যক করে না। পাপী কাঁদিলেই তাঁহাকে পায়, সন্তান চাহিলেই পিতার হস্ত হইতে ধন পায়। কেবল সরল মনে চাহিলেই হইল। পিতাপুত্রের সম্বন্ধ অনন্তকাল নিগূঢ়তম। ইহাদিগের মধ্যে ব্যবধান নাই। অহঙ্কার স্বার্থ আসিয়া ব্যবধান করিয়া দেয়। সেই অহঙ্কার স্বার্থ বিনাশ করিলেই পুত্র পিতাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পায়।

(৫)

নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম্ম। সমন্বয় কাহাকে বলে তাহা এখন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। জগতের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে আমরা কি দেখিতে পাই? কেবল বিবাদ মতভেদ এবং দলাদলি। এক একটি ধর্ম্ম সত্যধর্ম্ম বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার চক্ষে অন্যান্য সকল ধর্ম্ম সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রত্যেকে আপনার ধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন করে, এবং এই জন্য বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে এত জাতক্রোধ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই অনন্ত ঈশ্বরকে মানে, সকলেই তাঁহার বিষয় এক কথা বলে, সকলেরই নীতিশাস্ত্র এক, অথচ সকলেই বলে আমার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং অন্যান্য ধর্ম্ম মিথ্যা। আমরা এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কথা কিছুই মানি না। আমরা যখন ঈশ্বরের পুত্রত্ব মানিয়া লইয়াছি, তখন যেখানে যে পুত্র তাঁহার কথা প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করি। বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা তিনটি সার কথা পাই। সে তিনটি কথা এই :—

ধর্ম্ম-সমন্বয়।

১। কোন ধর্ম্মই সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে। সকল ধর্ম্মে সত্য আছে।

২। সকল ধর্ম্মে অতি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভক্ত আছে।

৩। সকল ধর্ম্মে পাপীর পক্ষে শান্তি আছে।

বোধ হয় কেহই এই তিনটি কথা অবিশ্বাস করেন না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ সকলেই একপ্রকার নীতি প্রচার করে, এক অনন্ত সত্যকে প্রচার করে। দ্বিতীয়তঃ প্রতি

ধর্ম্মসমাজে উৎকৃষ্ট ভক্ত আছেন। হিন্দু ভক্ত, খ্রীষ্টান ভক্ত উভয়েরই মুখের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। তাঁহারা সেই এক ঈশ্বরের সন্তান বলিয়া বোধ হয়। যদি সেই সেই ধর্ম্ম মিথ্যা হইত, তাহা হইতে উৎকৃষ্ট ভক্ত জন্মাইবার কোন সম্ভাবনা থাকিত না। মিথ্যা হইতে, ভ্রম হইতে, পাপ হইতে পুণ্যবান্ চরিত্র সমুদ্ভূত হয় ইহা কি কখন হইতে পারে? ক্রমাগত অন্ধকারে যাহারা থাকে তাহারা কি কখন আলোক দেখিতে পায়? যদি বল যে, ধর্ম্ম মন্দ হইতে পারে; মানুষ নিজগুণে ভক্ত হয়, পুণ্যবান হয়। এ কথার কোন অর্থ নাই। কেননা মনুষ্য এবং ধর্ম্ম যদি পৃথক হয় তাহা হইলে জগতে ধর্ম্মের উপকারিতা কি? ধর্ম্ম ছাড়িয়া যদি মানুষ পুণ্যবান হইতে পারে, তাহা হইলে ধর্ম্ম লইয়া আমাদিগের উপকার কি? মানুষকে লইলেই ত হয়? বাস্তবিক ধর্ম্ম লইয়া মানুষ, এবং মানুষ লইয়াই ধর্ম্ম। দুটি পৃথক করা যায় না। ধর্ম্ম ভাল হইলে মানুষ ভাল হইবেই হইবে, এবং মানুষ ভাল হইলেই বুঝিতে হইবে যে তাহার ধর্ম্মও ভাল। যদি কেহ বলেন যে, হিন্দুস্থানের সকল ধর্ম্মই মিথ্যা ও মন্দ, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি বুদ্ধ এত ভাল হইলেন কিরূপে? চৈতন্য, নানক, কবির ইহাঁরা ভাল হইলেন কি করিয়া? প্রসিদ্ধ ঋষিকুল এরূপ মহানুচেতা হইলেন কি প্রকারে? জীবন হইতে জীবন হয়; জীবন্ত ধর্ম্ম হইতে জীবন্ত ভক্ত সমুদ্ভূত হন। মৃত শব হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অবতার জন্মগ্রহণ

করিলেন ইহা কখনই হইতে পারে না। সেইজন্ম বলিতেছি যে, যখন সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উৎকৃষ্ট ভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সকল ধর্ম্ম এককালে মিথ্যা নহে। সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, সকল ধর্ম্মেই দৈব শক্তি আছে। এবং যখন সকল ধর্ম্মে দেবজীবন আছে তখন পাপীদিগের দুর্গতি কোথাও নাই। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ে পাপীদিগের উদ্ধারের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, সকল সমাজেই প্রাপীরা শান্তি পায় ইহা শুনিতে পাই। তবে ইহাই প্রমাণ হইতেছে যে, কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে।

কিন্তু কোন ধর্ম্ম সর্ব্বৈব মিথ্যা নহে শুধু ইহা বলিলেই হয় না। ধর্ম্ম সকল কোন্ বিষয়ে সত্য ইহা জানা আবশ্যক। ধর্ম্ম এই পদার্থ টির অনেক দিক্ আছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম মনের একটি একটি দিকের প্রতিনিধি। মনেরও অনেক দিক্ আছে। সেই সকল দিক্ আমরা মনোবিজ্ঞান হইতে জানিতে পারি। আপাততঃ তিনটি দিকের কথা উল্লেখ করিতেছি। প্রথমতঃ মানসিক বৃত্তির দিক্। এই দিক্ হইতে মন বিচার করে, বুদ্ধির চালনা করে, নানাপ্রকারে এ বস্তুর সহিত ও বস্তুর তুলনা করে, কল্পনা করে এবং পূর্ব্ব ঘটনা সকল স্মরণ করে। এইটি হইল বুদ্ধির দিক্। যে দিক্ দিয়া দেখিলে মানুষ পশু হইতে পৃথক্ বুঝা যায়। দ্বিতীয় দিক্টি ভাবের দিক্। এই দিক্ হইতে মন রাগ করে, ভালবাসে, দয়া করে, দুঃখ দেখিলে বিগলিত হয়,

উচ্চ আশায় উন্নত হয়, হিংসা করে, লোভে বিচলিত হয়, কামনায় দগ্ধ হয়, মদে মত্ত হয় ইত্যাদি। এই দিকে থাকিলে মন দেবভাব পায় কিম্বা পশুসমান হইয়া পড়ে। ইহার সদ্ব্যবহারে দেবত্ব, অসদ্ব্যবহারে পশুত্ব। তৃতীয় দিকটি ইচ্ছার দিক্। এই দিকে মন কার্য্যের প্রতি ধাবিত হয়। মানসিক বৃত্তি এবং ভাবের দ্বারা বিচলিত হইলে মন ইচ্ছা করিতে থাকে। ইচ্ছা হইলেই কার্য্য আসে। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। বিদ্যা-শিক্ষা করিলে নানা প্রকারে উপকার লাভ করি ইহা মানসিক বৃত্তি দ্বারা জানিতে পারিতেছি। কত লোকে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া আমার মনে বিদ্যাশিক্ষার কামনা আসিল। সেই কামনা করিতে করিতে বিদ্যালাভ করিবার ইচ্ছা হইল এবং সেই ইচ্ছা হওয়াতে আমি একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলাম। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মানসিক বৃত্তি, ভাব এবং ইচ্ছা মনের এই তিনটি দিক্ দেখান গেল।

এখন দেখিতে হইবে যে, সকল লোকের কিম্বা সকল জাতির এই তিনটি দিক্ সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয় কি না। কোন লোক বা কোন জাতির মানসিকবৃত্তি অতিশয় সতেজ; কাহারও বা ভাব প্রবল; কেহ কেহ বা কার্য্যে তৎপর। কাহারও ভিতর বা কোন দুইটির প্রাধান্য থাকে, তৃতীয়টির থাকে না। এসিয়া মহাখণ্ডে দেখি মানসিক বৃত্তির মধ্যে

কল্পনা এবং ভাবের মধ্যে ভক্তি অতিশয় বলবতী। কিন্তু কার্য্যের ভাগ অল্প। ইউরোপে কার্য্যের ভাগ সর্ব্বপ্রধান, মানসিক বৃত্তির মধ্যে তুলনা প্রভৃতি অতিশয় প্রবল, কিন্তু ভক্তি, যোগ প্রভৃতি অল্প। ইংরাজেরা এদেশে আসিয়া আমাদিগকে বলে—"তোমরা কেবল মনোবিজ্ঞান, ধর্ম্মশাস্ত্র, কল্পনা, যোগ এবং ভক্তি লইয়াই থাক। তোমাদিগের মধ্যে সত্যের আদর অধিক নাই। অতিরিক্ত দোষে তোমাদিগের সকল চেষ্টাই দূষিত। তোমরা যদি উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চাও, তাহা হইলে বিজ্ঞানের অনুশীলন কর এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও। কেবল অলস হইয়া আকাশের দিকে তাকাইলে চলিবে না।" আমরা আবার ইংরাজদিগকে বলি,—"তোমাদিগের মধ্যে কেবল কার্য্য কার্য্য। দিন রাত্রি অর্থের কামনায় কলের ন্যায় ঘুরপাক খাইতেছ। তোমরা বাহ্যজগতেই নিযুক্ত আছ। ইহজীবনই তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। পরলোক বিষয়ে কিছুই ভাব না। ঈশ্বরকে দূরে রাখিয়া কেবল ইহজীবনের কার্য্যে তোমরা তৎপর। তোমাদিগের মধ্যে যোগ, ভক্তি আরও অধিকতর রূপে প্রবল হওয়া উচিত, তাহা হইলেই তোমরা প্রকৃত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে।" বাস্তবিক দুই জনের কথাই ঠিক। জাতিবিশেষে কতকগুলি জাতীয় লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়; এবং সেই লক্ষণ গুলি থাকাতে জাতিতে জাতিতে মিল হয় না। মনের সকল দিক্ সকল লোকের সমান রূপে

প্রস্ফুটিত হয় না। অথচ সমানরূপে প্রস্ফুটিত হওয়ার নাম প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সেই লোক কিম্বা জাতি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যাহার মানসিক বৃত্তি প্রবলা, যাহার ভাব সকল উত্তম এবং সতেজ এবং যাহার ইচ্ছা সর্ব্বদাই কার্য্যে পরিণত হয়।

পৃথিবীতে যতগুলি ধর্ম্ম হইয়াছে তাহারা এই একটি একটি দিক লইয়া আসিয়াছে। কোন ধর্ম্মটি জ্ঞানের ধর্ম্ম; কোনটি ভাবের ধর্ম্ম, কোনটি বা ইচ্ছার ধর্ম্ম। আমাদিগের তিনটি ধর্ম্মই থাকা উচিত। তিনটি ধর্ম্ম একত্রিত হইলে বাস্তবিক একটি প্রকৃত ধর্ম্ম হয়। যে ধর্ম্মে জ্ঞানের প্রাধান্য, কিন্তু যেখানে ভক্তি নাই তাহা অসম্পূর্ণ। যে ধর্ম্মে ভক্তিই আছে অথচ জ্ঞান নাই, তাহা আংশিক মাত্র। যে ধর্ম্ম কেবল কার্য্য লইয়া থাকে, যেখানে ভক্তির নদী প্রবাহিত নাই তাহা শুষ্ক। সেই ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর যাহাতে এই তিন দিকই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত এবং যাহাতে একটির আদর এবং আর একটির অনাদর নাই, যাহাতে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মযোগ সকলই সুচারুরূপে সমন্বিত আছে। সেই মনুষ্যই শ্রেষ্ঠ যাহার মনে এই তিনটী দিক সমান ভাবে প্রস্ফুটিত; এবং সেই ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ যাহাতে এই তিন দিকেরই অভাব পূর্ণ হইয়া যায়।

এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্মটী কিরূপে পাওয়া যায়? প্রথমতঃ মনের একটি ভাব স্থির করিয়া লইতে হইবে। কোন ধর্ম্মই অনাদরের সামগ্রী নহে। বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটি ধূলিকণাকে কেহ অগ্রাহ্য করিতে পারে না। জীবশাস্ত্রে একটি সামান্য কীটের

মূল্য আছে। আমরা যদি একটি কীটকে অপরিষ্কার এবং ঘৃণিত বলিয়া তাচ্ছল্য করি, তবে সমস্ত শাস্ত্র অসম্পূর্ণ রহিল। জীবশ্রেণী সমুদয় স্তরে স্তরে সাজান আছে, একটির উপর আর একটি; একটিকে অগ্রাহ্য করিলে সকলকে অগ্রাহ্য করা হইল। একটিকে হারাইলে সৃষ্টির চাবি হারাইল। আর কিছু বুঝিবার উপায় থাকে না। বিজ্ঞানে সেই জন্য যেমন বড় বড় সামগ্রীর আদর তেমনি সামান্য কীটাণুকীটের সেইরূপ আদর। ভাষা-বিজ্ঞানে যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সংস্কৃতকে আদর করে, ঠিক তেমনি গারো কিম্বা সাঁওতাল কিম্বা অন্য কোন অসভ্য জাতির ভাষা-কেও আদর করে। সংস্কৃতে বাক্যবিন্যাসের পরাকাষ্ঠা দৃষ্ট হয়। কিন্তু অসভ্য ভাষাতে কিরূপে ধাতু বিভক্তিতে যুক্ত হইতেছে, কিরূপে সেই ধাতু এবং বিভক্তি উভয়ে একটি বাক্যেতে সমুপ-স্থিত হইতেছে, এই সকল ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই। সুতরাং ভাষাবিজ্ঞান বুঝিতে গেলে যেমন সংস্কৃত, গ্রীক্, লাটিনের আবশ্যক হয়, তেমনি অতি অসভ্য জাতির ভাষাপ্রণালী কিরূপ তাহাও জানা প্রয়োজন। সৃষ্ট কোন পদার্থকে অবজ্ঞা করিলে চলিবে না, ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে ধর্ম্ম বিজ্ঞানেও ইহা খাটিবে। অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান তাহাও যেরূপ আদরণীয় অতি সভ্যজাতিরও ধর্ম্ম সেই-রূপ আদরণীয়। আমরা দেখিতেছি যে, অনন্ত বোধ সুসভ্য এবং অসভ্য উভয়বিধ জাতির মধ্যে বর্ত্তমান

আছে। অসভ্য জাতির মধ্যে যাহা আছে তাহা হইতে আমরা মনুষ্য-সমাজের বাল্যাবস্থা অনুভব করিতে পারি। সেই বাল্যাবস্থা হইতে কিরূপে এই অনন্তভাব ক্রমে বর্দ্ধিত এবং পরিবর্ত্তিত হইতেছে তাহা সভ্যতার ইতিহাসে প্রতি-দেশে প্রতিযুগে কি কি হইয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারি। সেইজন্য সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম বুঝিবার জন্য সকল ধর্ম্মকেই বুঝিতে হইবে, এবং কোন ধর্ম্মকে তাচ্ছল্য করিলে চলিবে না। ধর্ম্মবিজ্ঞান আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, মনুষ্য-সমাজে কতকগুলি আশ্চর্য্যকর নিয়ম প্রচলিত আছে। সেই সকল নিয়মের অধীনস্থ হইয়া সকল দেশে এক অনন্ত বোধের ভিন্ন ভিন্ন আকার হইয়াছে, একনীতি ভিন্ন ভিন্ন দেশাচারে পরিণত হইয়াছে। যে-যে দেশের লোকেরা অদৃষ্টমানে সেই দেশের লোকদিগের স্বভাব, আচার নিয়ম প্রভৃতি একপ্রকার হয়, এবং যেদেশে স্বাধীন ইচ্ছার মত প্রচলিত সেই দেশের আচার ব্যবহার আর একপ্রকার। গ্রীসদেশে অদৃষ্টবাদের প্রাদুর্ভাব ছিল এবং সেখানে গৃহ এবং মন্দির নির্ম্মাণের প্রথা পর্য্যন্ত একপ্রকার ছিল, এবং এখনকার ইউরোপে যেখানে স্বেচ্ছাবাদ প্রচলিত আছে সেখানে গৃহনির্ম্মাণ প্রথাও আর একপ্রকার। যে দেশে ঈশ্বরের ন্যায়ভাব অধিক পরিমাণে স্বীকৃত সেখানে লৌকিক ব্যবহার একপ্রকার এবং যেখানে তাঁহার দয়ালুভাব অধিক পরিমাণে উপলব্ধ সেখানকার

ব্যবহার অন্য প্রকার। এক একটি ভাবের প্রাদুর্ভাবে এক একটি পৃথক ধর্ম্ম ও নীতিশাস্ত্র হইয়া থাকে। সকল ভাবগুলি মনুষ্যের মনের ভাব; সুতরাং সেই ভাব সমন্বিত হইয়া যে ধর্ম্ম জগতে অবতীর্ণ হয় তাহা আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। একটি একটি ভাব লইয়া এক একটি ধর্ম্ম। অতএব সব ভাবগুলি লইলে মনুষ্যপ্রকৃতি বুঝিতে পারিব এবং সমস্ত মনুষ্যপ্রকৃতি লইয়া যে ধর্ম্ম হয় সেই প্রকৃত ধর্ম্ম।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা ঈশ্বরের পুত্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়াছি। এই পুত্রভাব ধর্ম্মবিজ্ঞানের সার মর্ম্ম। আমরা দেখিতে পাই যে, সর্ব্বস্রষ্টা পরমেশ্বর একেবারে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবয়ব কিম্বা জাতি সৃষ্টি করেন নাই। তাঁহার এক একটি আদর্শ গঠিত করিবার জন্য অনেক যুগ লাগে। অতি সামান্য উদ্ভিজ্জ হইতে যেমন ক্রমান্বয়ে লতা বৃক্ষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পদ্ম কিম্বা গোলাপ জন্ম লাভ করে, অতি সামান্য ঘৃণিত পোকা মাকড় হইতে যেমন ক্রমেক্রমে জলজন্তু, পক্ষী, সরীসৃপ, পশু অবশেষে মনুষ্যরূপ হয়, ঠিক সেইরূপ প্রকৃতিপূজা হইতে ক্রমে ক্রমে প্রেতপূজা, অবতার-পূজা একেশ্বর পূজা সংস্থাপিত হয়। পৃথিবীর আচ্ছাদন যেমন স্তরে স্তরে নির্ম্মিত হইয়াছে ঠিক সেইরূপ জীব-জগত এবং ধর্ম্ম-জগত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হইয়াছে। যুগে যুগে একটির পর আর একটির আবির্ভাব হইয়াছে। সেই আবির্ভাব এখনও

চলিতেছে। অবশেষে এমন একটি আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হইবে যাহা সর্ব্বোপরি স্থাপিত এবং সকলের ভাবকে সমন্বিত করিবে। নিম্ন হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতর ধর্ম্মের উন্নতি চলিতেছে, এবং যতদিন না সেই ধর্ম্ম উচ্চতম সোপানে আরূঢ় হইয়া একটি উচ্চতম আদর্শরূপে পরিণত হইবে, তত দিন এই উন্নতি চলিবে।

জগতে বাস্তবিক এইরূপ ঘটিতেছে। ধর্ম্ম-পর্ব্বত স্তরে স্তরে উঠিয়াছে। জগতের শৈশবাবধি আজ পর্য্যন্ত ভগবানের লীলা চলিতেছে। তিনি যেমন একেবারে একটি উচ্চতম পদার্থকে সৃষ্টি করেন নাই, নীচ হইতে উচ্চ, উচ্চ হইতে উচ্চতম আদর্শে সেই পদার্থকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, ঠিক সেইরূপ নিম্নতম ধর্ম্ম হইতে উঠিয়া উচ্চতর ধর্ম্ম সকল আসিয়াছে, এখনও সেই স্তর সকল উঠিতেছে। অবশেষে সকলের উপর উচ্চতম ধর্ম্ম আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভগবানের লীলা, তাঁহার বিধান ইতিহাস পড়িলে সুন্দররূপে বুঝিতে পারি। যুগে যুগে, শতাব্দীতে শতাব্দীতে সেই সকল স্তর ক্রমে ক্রমে উত্থিত হইতেছে। যে সময়ে যে স্তরটী হওয়া উচিত ঠিক তাহাই হইতেছে। ইতিহাসের তারিখ মিলাইলে এই অদ্ভুত তত্ত্বটি আরও বোধগম্য হইবে। সকল ধর্ম্ম-ঘটনাতে এক তাঁহারই ইচ্ছা সাধিত হইতেছে। সেই ইচ্ছা এককালে সাধিত হইতেছে না—যুগে যুগে, ক্রমে ক্রমে, স্তরে স্তরে, ধাপে ধাপে, প্রস্ফুটিত হইতেছে। লোক, জাতি, সমাজ

একই দিকে—সেই অনন্ত ইচ্ছার পূর্ণতার দিকে ধাবিত হইতেছে। একটি যুগ দেখিলে, একটি দেশ দেখিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। সকল যুগ দেখিলে, পৃথিবীতে একাকার করিয়া দেখিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব। যেমন একটি বৃক্ষতলে থাকিয়া সমুদয় অরণ্যের মহিমা এবং গভীরতা বুঝা যায় না, যেমন একটি পর্ব্বতশিখর দেখিয়া সমস্ত হিমালয়ের মাহাত্ম্য বুঝা যায় না, তেমনি একটি ধর্ম্ম দেখিলে ভগবানের অনন্তলীলা বুঝিতে পারা যায় না। বৃক্ষসমূহ দেখ, পর্ব্বতশ্রেণী দেখ তবে অরণ্য ও পর্ব্বতের মহিমা বুঝিতে পারিবে। ঠিক সেইরূপ সকল দেশের সকল ধর্ম্ম দেখ, ভগবানের অপূর্ব্ব লীলা, রমণীয় বিধানশাস্ত্র বুঝিতে পারিবে। এই লীলার ইতিহাস আমরা গুটিকয়েক ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

জগতের শৈশবাবস্থা, ধর্ম্ম ইতিহাসের প্রাতঃকাল। মনুষ্য-শিশুরা প্রত্যূষে উঠিয়াই এই রব শুনিতে পাইল "আমি আছি!" কোথা হইতে এ রব আসিল? কে বলিল? যে বলিল তাহার নাম কি? গল্পটি অতি মধুর এবং মনোহর। মিসর দেশে ইহুদি জাতি বাস করিত। তথাকার রাজারা তাহাদিগকে অতিশয় অত্যাচার করিত। হঠাৎ তাহাদিগের মধ্যে এক জন ঈশ্বরের আদেশ লাভ করিলেন। পর্ব্বতের উপর মেঘমালার ভিতরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিলেন। সমুদয় ইস্রেলজাতি লক্ষ লক্ষ নরনারী

"আমি আছি"।

তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য বিধাতা একজন লোকের সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে আদেশ দিলেন। সেই আদেশ সকল এখনও মনুষ্যজাতির পক্ষে অভ্রান্ত নীতি-শাস্ত্র। মুসা ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? আপনার নাম কি ? ঈশ্বর বলিলেন, আমার নাম— "আমি আছি।" উপনিষদে যে সৎস্বরূপ ব্রহ্ম প্রচারিত, সেই ব্রহ্ম নিজে বলিলেন, আমার কোন নাম নাই। আমার নাম কেবল—"আমি আছি"। পৃথিবীর বাল্যাবস্থাতেই ভগবান নিজমুখে মনুষ্যদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি আছেন। ইহা অপেক্ষা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর অধিক প্রমাণের আবশ্যকতা কি আছে ? ধর্ম্মের আরম্ভ তাঁহাকে লইয়া। তিনি আছেন এটি স্বীকার না করিলে ধর্ম্ম হয় না। ঈশ্বর অভাবে নীতি কেবল প্রহেলিকা মাত্র। যে নীতি ঈশ্বরের আদেশস্বরূপে না আসে, তাহার বলও নাই তাহার স্থায়িত্বও নাই। দার্শনিকেরা যত কেন নীতিশাস্ত্রকে নিরী-শ্বর করিতে চেষ্টা করুন না, তাঁহাদিগের চেষ্টা বিফল হইবেই হইবে। ঈশ্বর বলিয়াছেন বলিয়াই সত্য কথা কহা উচিত, লোক হত্যা করা উচিত নহে। যাহারা ঈশ্বরকে মানে না তাহারা কেন কাহার খাতিরে সত্য কথা কহিবে ? স্বার্থের জন্য তাহারা সকল কার্য্যই করিতে পারে। সেই জন্য বলিতেছি যে, মনুষ্যসমাজের ভিত্তি নীতি, সেই নীতির ভিত্তি ঈশ্বর-আদেশ। সুতরাং লোকসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিবার

আগে নীতি প্রচলিত হওয়া আবশ্যক, এবং নীতি প্রচার করিতে গেলেই ঈশ্বরকে মানিতে হইবে। পাছে, লোকেরা প্রমাণাভাবে তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে না চাহে, সেই জন্য তিনি নিজে বলিয়া দিলেন "আমি আছি'। মুসা আদেশ-শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন। তিনি একেশ্বরবাদের প্রথম শিক্ষক। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করি।

নির্ব্বাণতত্ত্ব—ভাবের ধর্ম্ম।

ইস্রেল জাতি যখন মিসরের রাজাকে ত্যাগ করিয়া আসিল তখন ঈশ্বর নিজে তাহাদিগের রাজা, নিয়ন্তা এবং রক্ষক হইলেন। এক সমুদয় জাতি ঈশ্বরকে রাজা বলিয়া মানিত, বিপদে আপদে তাঁহার আজ্ঞা শুনিত, জীবনের প্রতি ঘটনাতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত এই মহান্ দৃশ্য কেবল ইস্রেলেরা দেখাইতে পারিয়াছে। তাহাদিগের ইতিহাস একটি স্বর্গের আখ্যায়িকাস্বরূপ। তাহা পাঠ করিলে আনন্দ হয় এবং বিশ্বাসের সহিত পড়িলে পরিত্রাণ হয়।

কিন্তু ইস্রেলেরা এই উচ্চ আদর্শ অধিক দিন রক্ষা করিতে পারে নাই। ঈশ্বর আছেন, তিনি নিজে কথা কহেন, পুণ্যের পুরস্কার এবং পাপের দণ্ড দেন এ কথাগুলি লোকে মানিল। কিন্তু, মনুষ্য-প্রকৃতি দুর্ব্বল, ষড়রিপুর বশীভূত। মনের চাঞ্চল্য হেতু আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাই, এবং যত

ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হইব তত তাঁহার নিকট উপস্থিত হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য লোকেরা তাঁহার নিকট যাইবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া লয়। বাহ্য ব্যাপার দ্বারা তাহারা পরমাত্মাকে বশীভূত করিতে চাহে। জীব-হত্যা করিয়া, মন্ত্র পাঠ করিয়া নানাবিধ অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা ধর্ম্মকে সুলভ করিয়া ফেলে। "আমি আছি" এই তত্ত্বের অবশ্যম্ভাবী ফল নীতি। "আমি আছি" বিশ্বাস করিলে যেমন নীতি আপনাপনি আসিবেই আসিবে, তেমনি নীতি থাকিলে "আমি আছি" নামে যে ঈশ্বর আছেন তাঁহার কাছে যাওয়া সহজ হইবেই হইবে। কিন্তু নীতি অবলম্বন করা অতিশয় দুরূহ ব্যাপার। এইজন্য মনুষ্যেরা হয় নীতিকে সহজ করিয়া লয়, না হয় বাহ্যিক উপায়ে ঈশ্বরের নিকট পৌঁছিতে চেষ্টা করে।

ভারতবর্ষে এই দুর্ভাগ্য ঘটিয়াছিল। এখানেও আদেশতত্ত্ব প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এখানে বাহ্য ধর্ম্ম আসিয়া একেবারে প্রকৃত ধর্ম্ম এবং নীতিকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।—মন্ত্রপাঠ, বলিদান, যজ্ঞ, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি অস্বাভাবিক ভক্তি, অনাহার, বনবাস, সাধনের যতপ্রকার কঠোর নিয়ম প্রণালী পরিত্রাণের উপায় বলিয়া বিবেচিত হইত। লোকে দুরাচার করুক, মন অতি জঘন্য হউক, বাহ্যিক অনুষ্ঠান করিলেই পরকালে গতি হইবে এই বিশ্বাস ছিল। এই বাহ্যিক ধর্ম্মে প্রকৃত ধর্ম্ম লোপ পাইল এবং জনসমাজের

ভিত্তি যে নীতি তাহাও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তর্ক বিতর্ক অতিশয় শুষ্ক এবং নিষ্ফল হইয়া পড়িল। ঈশ্বরের স্বরূপ কেবল 'নেতি নেতি' ভাবে পরিণত হইল। তিনি ইহা নহেন, ইহা নহেন, কিন্তু তিনি যে কি, এ বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র কোন আলোক প্রদান করিতে পারে নাই। বুদ্ধ যখন ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন তখন তিনি নিজে ধর্ম্মপিপাসু এবং পরিত্রাণাকাঙ্ক্ষী হইয়া জীবন আরম্ভ করেন। তিনি নিজে সমুদয় বাহ্যিক অনুষ্ঠান দ্বারা সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, তাহাতে তাঁহার মনস্কামনা কিছুই চরিতার্থ হইল না, তিনি সংসার মোহপাশ হইতে মুক্ত হইতে চাহিলেন। কিন্তু বাহ্যিক ধর্ম্মে তাহা কিছুতেই হইল না, মনের পাপ মনেই রহিল। তিনি চাহিলেন ধর্ম্ম কিন্তু নির্গুণ ঈশ্বর দ্বারা তাঁহার ধর্ম্ম-পিপাসার শান্তি হইল না। ছয় বৎসর কঠোর সাধন করিয়া অবশেষে তিনি বুঝিতে পারিলেন, যে প্রচলিত সমস্ত ধর্ম্মবিষয়ক মত ভ্রান্ত এবং মহা অনিষ্টকর। তিনি নিজের অভাব দিয়া মানবজাতির অভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ঈশ্বরবিষয়ক মতামত প্রকাশ করিলে লোকদিগকে আরও একটি গোলক-ধাঁধাঁতে ফেলা হয়। সুতরাং তিনি সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ পর্য্যন্ত করিলেন না। অনেকে সেইজন্য তাঁহাকে নাস্তিক বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে। কিন্তু আমরা লীলাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছি। ভগবানের সকল লীলার মধ্যে বুদ্ধের আবির্ভাবও

একটি লীলা। ইহার একটি প্রকাণ্ড অর্থ আছে। ভাব-চক্ষে দেখিলে সে অর্থ পরিষ্কার হইয়া যায়। বুদ্ধ প্রকৃত ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিলেন। যে ঈশ্বরকে মুসা দেখিয়াছিলেন এবং যাঁহার কথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সে ঈশ্বরকে লোকে বাহ্য উপায়ে পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়া পাইল না। আদেশ এবং প্রত্যাদেশ না হইলে ধর্ম্মের কোন উপকারিতা নাই। আমি যদি বিপদের সময় তাঁহার নিকট প্রার্থনার উত্তর না পাইলাম, আমি যদি পরীক্ষার স্থলে তাঁহার নিকট কি করা উচিত তাহা জানিতে না পারিলাম, তাহা হইলে ধর্ম্ম লইয়া আমার কি ফল? মনুষ্য কি উপায়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে এই প্রশ্নই ধর্ম্মের প্রধান ও প্রথম প্রশ্ন। পুত্র পিতার নিকট যাইবে কোন্ পথ দিয়া? এই প্রশ্নের অনেকগুলি উত্তর আছে। বুদ্ধ তাহার প্রথম উত্তর দিবার জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। এটি যেন আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি যে, তিনি ঈশ্বর বিষয়ক কোন কথা আমাদিগকে বলিতে আসেন নাই। তিনি ঈশ্বরেতে যাইবার পথ পরিষ্কার করিতে আসিয়াছিলেন। সেই পথ ধরিলে আমরা নিশ্চয় ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব। অতএব সেই পথ কি ইহা আমাদিগের নিরূপণ করা উচিত।

সেই পথটি এই।—মনুষ্যের মন পাপ-পুণ্যের আবাস। ইহা পাপের আবাস এই জন্য যে, ইহার সহিত শরীরের দৃঢ় বন্ধন আছে, এবং সেই শরীরের ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা ইহার ভিতর নানাবিধ

কামনা প্রবেশ করে। সেই কামনা সকল অগ্নির ন্যায় মনকে চিরদগ্ধ করিতেছে। এবং সেই কামনা-অগ্নি যতদিন জ্বলিতে থাকে ততদিন ধর্ম্মই কর, আর বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপই কর, মনে শান্তি কখনই হইবে না। আমরা নিজ নিজ জীবনে দেখিতে পাই যে, প্রতিদিন উপাসনা করিয়াও আমরা পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারি না। ইহার অর্থ কি? নিশ্চয় মনে কামনা আছে বলিয়া আমরা ঈশ্বরকে সরল ভাবে ডাকিতে পারি না। আমরা বলিতেছি যে, "হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার প্রতি অনুরক্ত কর। তোমা ছাড়া যেন আমরা কাহা-কেও না চাহি। চিরদিন যেন তোমার দাস হইয়া থাকি।" কিন্তু আমাদিগের মন সেই কামনা—অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। ঈশ্বর অপেক্ষা আমরা শরীরকে, সংসারকে অধিক ভালবাসি। ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া আমরা ঈশ্বরের দাস হইতে পারি না। সুতরাং আমরা যতবার তাঁহাকে ডাকি, ততবার আমরা মিথ্যা অসরলতা দোষে দোষী হই। উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের কথা এই যে, প্রত্যাদেশ অবস্থাতে, গভীর যোগের অবস্থাতে, ভক্তি-সমুদ্রের উপর, পাপ মনকে অধিকার করিয়া থাকিতে পারিবে না। কেননা, যে মন সংসার-চিন্তায় পূর্ণ, সে মন স্বার্থশূন্য নহে, সুতরাং সে মনে ঈশ্বর স্থান পান না। যে মন অহংশূন্য হইয়াছে সেই মনেই ভগবানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু মনুষ্যেরা মনকে কামনা-শূন্য করাকে অতিশয় দুঃসাধ্য মনে করে, এবং সেই জন্য নানা প্রকার বাহিক বুজরুকি আসিয়া ধর্ম্মকে সহজ করিতে

চেষ্টা করে। বুদ্ধ দেখিলেন যে, এইরূপ মিথ্যা প্রবোধ দিয়া ভারতবাসীরা অধঃপাতে যাইতেছে। তিনি আর কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ঈশ্বর বিষয় শিক্ষা তিনি একবারেই দিলেন না। কেননা মন কামনাপূর্ণ থাকিলে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে না এবং ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ না করিয়া ঈশ্বরকে যিনি বুঝিতে যান তিনি অন্ধ, এবং যাঁহাকে বুঝান তিনিও অন্ধ। যেন অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইতে চেষ্টা করিতেছে। তিনি যদি ঈশ্বর বিষয়ে কিছু বলিতেন কেহই কিছু বুঝিত না। সেই জন্য ভগবান যেন এই বলিয়া তাঁহাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলেন—"তুমি আমার বিষয় বলিয়া লোকদিগকে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিওনা। আমার নিগূঢ়তত্ত্ব আমি পৃথিবীতে পরে পাঠাইব। আপাততঃ তুমি পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়া এস। লোককে এই বুঝাইয়া দিও যে, বাহ্য জগত দিয়া আধ্যাত্মিক রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। শরীর-সম্ভূত যত বাসনা আছে তাহা চরিতার্থ করিতে গেলে মনে বিকার থাকিবেই থাকিবে, মানুষ পাপশৃঙ্খলে বদ্ধ থাকিবেই থাকিবে এবং যত কেন ভাল হইতে চেষ্টা করুক না, সে সংসারে আরও জড়াইয়া পড়িবে। সুতরাং লোকে যদি শান্তি সম্ভোগ করিতে ইচ্ছা করে, কামনা বিনাশ করিতে বল। এই অগ্নি নির্ব্বাণ হইলেই তাহারা সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" বুদ্ধ পৃথিবীতে আর কোন কথা বলিতে আসেন নাই। তিনি নাস্তিক ছিলেন এ কথা ভুল। তিনি কেবল ইহাই বলিয়াছিলেন যে, "তোমরা ঈশ্বরকে দেখ নাই, অথচ

ঈশ্বরের কথা বলিতেছ ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? ঈশ্বরকে দেখিবার পূর্ব্বে যে অবস্থা হওয়া উচিত, তাহাই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি। সে অবস্থা নির্ব্বাণ, অর্থাৎ কামনার নির্ব্বাণ। তোমরা এ কথা জান না। তোমাদিগের অজ্ঞানতা-বশতঃ এত কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে। অজ্ঞান বলিয়াই তোমরা জীবনে এত যন্ত্রণা ভোগ কর। তোমাদিগের কষ্টের কারণ কি তাহা জান, তাহা হইলেই তোমরা প্রকৃত পথ ধরিতে পারিবে।" অনেকে বলেন যে, নির্ব্বাণের অর্থ মৃত্যুর পরে এ শরীর আত্মার একেবারে বিনাশ। ইহাও প্রকাণ্ড ভুল। যদি বৌদ্ধদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি বল যে, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলে মৃত্যুর পর আত্মা আর থাকিবে না? তাহারা ইহার উত্তর দিবে যে, "এ বিষয়ে ভগবৎ কোন আলোক প্রদান করেন নাই। তিনি নির্ব্বাণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু নির্ব্বাণের অবস্থাতে আত্মা কিরূপে থাকিবে এ বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই।" বাস্তবিক বুদ্ধের ঠিক এই কথা তিনি নির্ব্বাণ প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন; তাহার উপর একটি কথা অধিক বা অল্প তিনি বলেন নাই। ভগবানের ন্যায় শাস্ত্র এই প্রকার। অনধিকার চর্চ্চা তিনি কাহাকেও করিতে দেন নাই। পৃথিবীতে এরূপ সংস্কার আছে যে, যিনি ঈশ্বর-প্রাদিষ্ট তিনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান। ইহা ঠিক নহে। বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষেরা ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেইজন্য কি তাঁহারা বিজ্ঞানেও শ্রেষ্ঠ হইবেন,

না আকাশের নক্ষত্র মণ্ডলে কি কি আছে সে বিষয়ে জ্ঞান দান করিবেন ? বাস্তবিক কথা এই যে, যিনি যে বিষয়টী ঈশ্বর হইতে লইয়া আসিয়াছেন সেইটি ছাড়া আর একটি কথা অধিক বলিতে পারেন না। সেই বিষয়টি বলিবার সময় তাঁহাদিগের মুখ হইতে জ্বলন্ত অগ্নি নির্গত হইবে, তাঁহাদিগের ক্ষমতা পৃথিবীময় অনুভূত হইবে। কিন্তু তাহার বাহিরে একটি কথা বলিতে হইলে তাঁহারা নিতান্ত নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবেন।

নির্ব্বাণতত্ত্ব দিয়া ভগবান এক প্রকাণ্ড আধ্যাত্মিক প্রকৃতির নিয়ম প্রচার করিলেন। আমরা বলিয়াছি যে, মনুষ্য-প্রকৃতিতে একটি ভাগ আছে তাহার নাম ভাব। আমরা ইহাও বলিয়াছি যে এই ভাব দেবভাব হইতে পারে পশুভাবও হইতে পারে। পশুভাব মানে কামনা সকল, যাহাদিগের সহিত শরীরের যোগ আছে। সেই সকল ভাব লইয়া লোকে "আমি আছি" বলিয়া থাকে। অহং এই পদার্থের এক ভাগ হইল কামনা। যদি উচ্চ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে এই কামনাগুলি নির্ব্বাণ করিতে হইবে। কামনা নির্ব্বাণ করিলে কি হইবে ? অহং শূন্য হইবে। শূন্য হইলে প্রকৃতির নিয়ম এই যে আর একটি পদার্থ বাহির হইতে আসিয়া সেই অহংকে পূর্ণ করিবে। সুতরাং ভগবান আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, "যদি তোমরা ভাল হইতে চাও, আমার ভাবে ভাবুক হইতে চাও, তাহা হইলে কামনাকে নির্ব্বাণ কর, মনকে শূন্য কর ; এবং শূন্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, দেবভাবগুলি মনকে

অধিকার করিয়াছে। এই আধ্যাত্মিক জগতের প্রধান নিয়ম। বুদ্ধ যখন কামনা নির্ব্বাণ করিয়া মনকে খালি করিলেন, তখন তাঁহার মনে অপূর্ব্ব একটি শক্তি আসিল। সেই শক্তির বলে তিনি দেশকে কম্পিত করিয়া তুলিলেন। যিনি সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আসিতে পারিলেন তাঁহার মন দয়াতে পরিপূর্ণ হইল। জীবে দয়া তিনিই পৃথিবীতে প্রথম প্রচার করেন। আমরা বুদ্ধের জীবনে এই শিক্ষা পাইলাম যে, যে পরিমাণে আমরা স্বার্থহীন হইব সেই পরিমাণে আমাদিগের হৃদয় দেবভাবে পূর্ণ হইবে এবং সেই পরিমাণে আমরা উন্নত ধর্ম্মজীবন পথের পথিক হইব।

মন কামনা শূন্য হইলেই কি উন্নতির পূর্ণতা হইল? না। এই সবে আরম্ভ। ধর্ম্মপথ এখনও সম্মুখে পড়িয়া আছে। মনের একটি অংশ কেবল ভাব। সেই ভাব-বিষয়ে স্বার্থহীন হইলে, মানুষ ধর্ম্ম-জীবনের পথে পদ নিক্ষেপ করিতে পারে। কিন্তু পুণ্য-বান হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ নষ্ট হয় না। বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ইতিহাসে আমরা দেখিয়াছি, আমরা পৃথিবীতেও সচরাচর দেখিতে পাই যে, পুণ্যবান্ হইলে একটি অহঙ্কার আসে যাহা আবার উন্নতির পক্ষে পরম প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়ায়। বৌদ্ধেরা বলে যে, যে কামনাকে নির্ব্বাণ করে তাহার সর্ব্বজ্ঞতা

জ্ঞানের ধর্ম্ম।

লাভ হয়। সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান্ সকলই দেখিতে পায় এবং তাহার সম্মুখে দেবতারাও নিকৃষ্ট হয়। সুতরাং কামনা বিনাশ হইলেও অহঙ্কার যায় না। এইঅহঙ্কারটী নিবৃত্ত করিতে হইবে। আমি সকল বিষয় জানি, আমার সকল বিষয়ে জ্ঞান আছে, এই বোধটী প্রকাণ্ড অনর্থের মূল। অতএব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ধর্ম্ম পাইবার জন্য আর একটি বিধান আবশ্যক হইল। এটি জ্ঞানের বিধান, এবং ইহা প্রচার করিবার জন্য সক্রেটিস্ প্রেরিত হইলেন।

সক্রেটিস্ একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। তাঁহার বিদ্যা অধিক ছিল না, অতিশয় গরিব এবং মুখের সৌন্দর্য্য কিছুই ছিল না, বলিলে হয়। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল, তর্কশক্তি অদ্ভুত ছিল এবং চরিত্রের নির্দ্দোষিতা দেববৎ ছিল। ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, সত্যের প্রতি অনুরাগ, কর্ত্তব্যবোধ এবং উন্নত নীতি এমন আর কাহারও ছিল না। তিনি আথেন্স্ নিবাসী গ্রীক্, প্রত্যহ সর্ব্বপ্রহর পথে, মাঠে, হাটে লোকদিগের সহিত দর্শনশাস্ত্র এবং দৈবজ্ঞানি লইয়া সদালাপ এবং চর্চ্চা করিতেন। গ্রীসদেশে, ডেল্‌ফি বলিয়া স্থানে একটি জগদ্বিখ্যাত সূর্য্যদেবের মন্দির ছিল। সেই মন্দিরে একজন স্ত্রীলোক পৌরহিত্য কার্য্য করিতেন গ্রীসদেশে যখন যে কেহ ভবিষ্যদ্বাণী শুনিতে চাহিত সে সেই ডেল্‌ফির মন্দিরে প্রশ্ন করিয়া লোক পাঠাইত। ডেল্‌ফির মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে দুইটি কথা লেখা ছিল— "নিজেকে জান"। একদিন সক্রেটিসের কোন বন্ধু সেই মন্দিরে

গিয়া এই প্রশ্ন করিলেন—"গ্রীসে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী ব্যক্তি কে?
পুরোহিত উত্তর দিলেন—"সক্রেটিস্"। বন্ধুটি সক্রেটিস্‌কে এই কথা বলিলে তিনি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তিনি বলিলেন "কি? আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী? এতদিন যে দেবদেবীর উপর আমার বিশ্বাস ছিল তাহা আর রহিল না। আমা অপেক্ষা অনেক জ্ঞানী গ্রীস্‌দেশে আছে। আমি তাহাদিগের অপেক্ষা কিসে জ্ঞানী হইলাম?" দেবতা বলিয়াছেন, এ কথার কোন অর্থ আছে। এই মনে করিয়া তিনি যে সকল লোক জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন তাঁহাদিগের নিকট এক এক করিয়া গেলেন। প্রত্যেকের কাছে গিয়া দেখিলেন যে সকলেই বলিতে লাগিল—"আমি জ্ঞানী; আমি এ বিষয় জানি"। অথচ দুই একটা সহজ প্রশ্ন করিলে তাহার উত্তর কেহই দিতে পারিল না। সক্রেটিস্ অবশেষে বলিয়া উঠিলেন—দেবতা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ঠিক। কেন না সকল লোক জানি বলিয়া ভান করে, অথচ তাহারা কিছুই জানে না। আমি কিছুই জানি না এবং আমি সকলকে বলি যে আমি জানি না। সুতরাং আমিই প্রকৃত জ্ঞানী।" যে লোক নিজের অজ্ঞতা স্বীকার করে সেই আসল জ্ঞানী। বাস্তবিক প্রকৃতি বা দেবতত্ত্ব বিষয়ে আমরা কি জানি? এই যে জড়পদার্থ, আত্মা, ইহারা কি, এখন কি কেহ বলিতে পারিয়াছেন না পারিবেন? এই বিশ্ব কোথা হইতে আসিল, কোথায় যাইবে? মানুষ কি? তাহার পরিণাম কোথায়? পৃথিবীতে যে এত সকল অদ্ভুত শক্তি

নিহিত রহিয়াছে ইহারা কি ? এক খণ্ড মেঘ আকাশে দৃশ্যমান হইল, আর তাহা হইতে এমন তর্জ্জন গর্জ্জন হইল যে, কর্ণ বধির হইয়া যায় এবং এমন অগ্নির ছটা উঠিল যে, চক্ষু অন্ধপ্রায় হয়। অবশেষে প্রকাণ্ড পর্ব্বত পর্য্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড হইয়া গেল ? কিরূপে এ শক্তি উৎপাদিত হইল কে বলিতে পারে ? একটি ফল গাছ হইতে নিম্নে পড়িল, উচ্চে উঠিয়া গেল না কেন কে বলিতে পারে ? যদি বল মাধ্যাকর্ষণে হইল, সেটি গোঁজামিলন দেওয়া হইল না কি ? কোথায় বল দেখি আকর্ষণী শক্তিটী আছে ? কে তাহা দেখিয়াছে ? কিরূপে তাহা উদ্ভূত হইল, কে বলিতে পারে ? আমরা জ্ঞানের স্পর্দ্ধা যতই করি না কেন, প্রকৃতির গূঢ় অর্থ কিছুই বুঝিতে পারি না। নিউটন বলিয়াছিলেন,—"সমস্ত সত্যের সমুদ্র চক্ষের সম্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে। আমি কেবল কূলে বসিয়া দুই একটি প্রস্তরখণ্ড সঞ্চয় করিতেছি।" তিনি বলিতেন যে তিনি কিছুই জানেন না। সক্রেটিস্ অজ্ঞানবাদ প্রচার করিয়া দর্শনশাস্ত্রের সূত্রপাত করেন। তখন হইতে লোকে দেবরহস্য জানিতে আর চেষ্টা করিত না; যতটুকু প্রত্যক্ষ হয় তাহাই দর্শনের ভিত্তি বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। সেই প্রকৃত জ্ঞানী যে সরলভাবে বিশ্বাস করে যে, আমি কিছুই জানি না। সক্রেটিস্ এক যুক্তির আঘাতে অহঙ্কার বিনাশ করিয়া ফেলিলেন।

যখন তিনি এইটী বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি সকলকে এই সত্যটি বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে তাঁহার অনেক শত্রু হইল বটে, কিন্তু তিনি নির্ভীকচিত্তে কর্ত্তব্যপালন করিতে ক্রটী করিলেন না। অবশেষে তাঁহার শত্রুরা তাঁহার নামে ভয়ঙ্কর অভিযোগ আনিল এবং সেই অভিযোগে তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইল। যতগুলি অপবাদ তাঁহার বিরুদ্ধে আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি এই যে, তিনি নূতন দেব-দেবী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার একটি গভীর অর্থ ছিল তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত।

সক্রেটিস্ সর্ব্বদাই বলিতেন আমি কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। অথচ বন্ধুরা তাঁহাকে এত ভক্তি ও বিশ্বাস করিত যে, বিপন্ন হইলেই তাহারা তাঁহার নিকট পরামর্শ লইতে আসিত; এবং তাঁহার পরামর্শ লইয়াই তাহারা বিশেষরূপে উপকৃত হইত। অতএব সেই বন্ধুরা যখন সক্রেটিস্‌কে বলিতে শুনিত যে তিনি কিছুই জানেন না, তাহারা সে কথায় বিশ্বাস করিত না, বরং তাহারা বলিত, "তুমি কিছুই জান না এ কথার অর্থ কি? আমরা দেখিতেছি যে, ভবিষ্যৎ বিষয়ে তোমার এত সূক্ষ্ম দৃষ্টি যে, পরামর্শ দিবার সময় আমাদিগের কিসে ভাল হইবে, কিসে অমঙ্গল হইবে, তাহা তুমি ঠিক করিয়া দাও। তবে তুমি জান না কি?" এ কথার উত্তরে সক্রেটিস্ বলিতেন,—তোমরা বুঝি মনে কর যে, পরামর্শ সকল আমি দি? আমার ভিতরে একজন দৈবাত্মা আছেন। তিনি আমার ভিতর

দিয়া কথা কহেন। আমি কিছু করিব কি না, কোথাও যাইব কি না, এ বিষয়ে তিনি বলিয়া দেন,—করিও না কিম্বা যাইও না। বন্ধুদিগকে পরামর্শ দিতে গেলেও তিনি তাহাই বলিয়া থাকেন। সুতরাং আমি কথা বলি ইহা বিশ্বাস করিও না। সেই দেবাত্মা ভিতর হইতে কথা কহেন। সক্রেটিসের এই কথা লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে যে কত বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে তাহা বর্ণনা করা যায় না। কেহই ঠিক মতটী ধরিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সক্রেটিসের যে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ছিল তাহাকেই তিনি দেবাত্মা বলিয়া গিয়াছেন। কাহারও মতে তিনি একটি কুসংস্কার বিশ্বাস করিতেন, সেটী কেবল তাঁহার দুর্ব্বলতার পরিচয় মাত্র। ইহা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য নহে। নববিধান-শাস্ত্রে আমরা ইহার প্রকৃত অর্থ পাইতেছি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মন শূন্য হইলেই উপর হইতে দেবভাব আসিয়া তাহাকে পূর্ণ করে। বুদ্ধের সম্বন্ধে আমরা ইহা বুঝাইয়া দিয়াছি। তিনি কামনাকে নির্ব্বাণ করিয়া হৃদয়ের ভাবের দিক্‌কে খালি করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনকে দেবভাব আসিয়া অধিকার করিল। সক্রেটিস্ জ্ঞানের দিক হইতে মনকে শূন্য করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি কিছুই জানি না। সুতরাং স্বকপোলকল্পিত বিশ্বাস তাঁহার কিছুই রহিল না। কুসংস্কার, কল্পনা, স্বরচিত মনের ভাব এ সকল তাঁহাকে পীড়ন করিত না। তাঁহার মন শূন্য

হইল, এবং শূন্য হইবামাত্র তাঁহার মনে দেবতা আসিয়া নিজে কথা কহিতে লাগিলেন। তিনি যাঁহাকে দেবাত্মা বলিতেন, তাঁহার পরম শিষ্য প্লেটো তাঁহাকে লোগস্, অর্থাৎ বাক্য অর্থাৎ অনন্ত জ্ঞান বলিতেন। আমরা তাহাকে সহজ ভাষায় বিবেক কিম্বা ঈশ্বরবাণী বলি। কুকর্ম্ম করিতে গেলে অন্তরের যে বাণী বলিয়া দেয় যে এ কাজটি করিও না; ঘোর পরীক্ষার সময় যে বাণী বলিয়া দেয় যে এ কাজটি কর, তাহাই দেবাত্মা বা ডিমন্ বা লোগস্ বা বিবেক বা আদেশ। যে লোক বিনয়ী হইয়া, নিজেকে অজ্ঞান বিবেচনা করিয়া, ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া, জীবনের ঘোর কণ্টকময় পথে পদক্ষেপ করে, সেই লোকই নিরন্তর এই বাণী শুনিতে পায়। সক্রেটিসের উপর যখন প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়, যখন তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, তখন তাঁহার বন্ধুরা আসিয়া তাঁহাকে পলাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারা অর্থের আনুকূল্য করিয়া তাঁহাকে বিদেশে পাঠাইতে সম্মত হইলেন। সক্রেটিস্ বলিলেন, "না। সেই দৈববাণী হইতেছে—দেবাত্মা বলিতেছেন,—কোথাও যাইও না।" সেই দৈববাণীর অনুরোধে তিনি সহাস্যবদনে, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মার অমরতা-বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে, বিষপান করিলেন, নিজ বিশ্বাস-বল, নিজ প্রাণ দিয়া দেখাইয়া গেলেন। এই দৈববাণী তিনি শুনিতে পাইতেন, আজ পর্য্যন্ত লোকেও ইহা শুনিতে পায়। ইহার নিয়ম এই,—"মনকে খালি কর।

বিনয়ী হও। আপনাকে অজ্ঞ জানিয়া প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান কর; দেখিবে ভগবান আসিয়া তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়া দিবেন।"

জ্ঞানের অহঙ্কার বিনাশ কিম্বা কামনার নির্ব্বাণ করিলেই ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশলাভ হয় না। বুদ্ধ এবং সক্রেটিস উভয়ে কেবল ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে কাহাকেও লইয়া যাইতে পারেন নাই। বুদ্ধ নির্ব্বাণশাস্ত্র শিখাইয়া কাহাকেও ঈশ্বর-তত্ত্ব দিতে পারেন নাই। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ আজও ঈশ্বরজ্ঞানবিহীন হইয়া দিনপাত করিতেছে। সক্রেটিস্ জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ করিয়াও দেবদেবীর বিশ্বাস ছাড়িতে পারেন নাই। আর একটি বিধান আসিয়া ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিল। সে বিধানটির নাম খ্রীষ্টীয় বিধান।

ইচ্ছার ধর্ম্ম।

যখন এই বিধান স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হয় তখন পৃথিবীর অতিশয় সুসভ্য অংশ রোম-সাম্রাজ্যের অধীনস্থ ছিল। সেই রাজ্যের একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট ছিল। তাহার বাহুবলে, বুদ্ধিবলে ইউরোপ, এসিয়া এবং আফ্রিকার অনেক অংশই সেই সম্রাটকে, কেবল রাজা বলিয়া নহে, দেবতা বলিয়া স্বীকার করিত। যেমন অন্যান্য দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি এবং মন্দির প্রতিদিকে স্থাপিত হইত, তেমনি সম্রাটের প্রতিমূর্ত্তিও গ্রামে গ্রামে, নগরে

নগরে স্থাপিত হইয়াছিল, এবং সমুদয় নরনারীরা তাঁহাকে পূজা করিত। যে দেশে যেরূপ ধর্ম্ম সেই দেশে তাহার অনুরূপ আচার ও ব্যবহার হইবে। যে সম্রাট লইয়া রোমের ধর্ম্ম ছিল, সে সম্রাট প্রকাণ্ড বাহুবলের প্রতিনিধি ছিলেন। ঐহিক ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, প্রতাপ—এই সকল লইয়া তাঁহার দেবত্ব। সুতরাং তখনকার লোকে এই সকলেরই দাস হইয়াছিল। জড়ের উপাসনা রোমদেশে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। পরকালে বিশ্বাস একপ্রকার ছিল বটে, কিন্তু তাহা পরিষ্কার কিম্বা স্থিরনিশ্চয় ছিল না, সুতরাং তখনকার লোকে জীবন লইয়া ব্যস্ত থাকিত এবং শারীরিক সম্ভোগ লোকদিগের একমাত্র উচ্চকামনার পদার্থ হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, তখনকার পাপস্রোত অতিশয় প্রবলবেগে প্রবাহিত ছিল। এমন সকল পাপ তখনকার লোকদিগকে অধিকার করিয়াছিল যে তাহা মনে করিলেও কর্ণে হস্ত দিতে হয়। বাস্তবিক বোধ হয় যে, ঠিক সেই সময় একজন পরিত্রাতা অবতীর্ণ হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। যদি যথা সময়ে ঈশা জন্মগ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে বোধ হয় পৃথিবী পাপভারে উল্‌টা পাল্‌টা হইয়া যাইত।

ঈশার সময়ের ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে তিনটি জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান জাতি রোম্যান। তাহারা যোদ্ধা, রাজনীতিজ্ঞ, অথচ শারীরিক সম্ভোগবিষয়ে নিতান্ত

পশুসদৃশ ছিল। আধ্যাত্মিক ভাব তাহাদিগের কিছুই ছিল না। কেবল জড়বাদ, শরীরতত্ত্ব এবং সম্ভোগশাস্ত্র। মনুষ্যের হৃদয়ে যে পশুভাব আছে তাহার প্রতিনিধি রোম্যানেরা ছিল। তাহার পর গ্রীক জাতি। ইহারা মনুষ্যের শারীরিক ও মানসিক উভয় দিকের উন্নতিসাধনের চেষ্টা করিত; এবং ইহাদিগের "সুন্দর" ভাবটি অতিশয় পরিষ্কার রূপে প্রস্ফুটিত ছিল। "সুন্দর" এই ভাবকে তাহারা পূজা করিত। সুতরাং তাহারা যাহা করিত, তাহাই—সুন্দর হইত। তাহাদিগের কার্য্য, নাটক, দেশহিতৈষিতা, চিত্র, প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি, দেবদেবী, নরনারী সকলই সুন্দরের দিকে প্রধাবিত হইত। সুন্দর নরনারী জন্মাইলে তাহারা তাহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া পূজা করিত। নারীজাতি দেবতাদিগের নিকট কেবল এইটিই প্রার্থনা করিত—"আমাকে একটি সুন্দর বালক কিম্বা বালিকা দাও।" এরূপ ভাব থাকিলে কি প্রকারে পাপ আসিতে পারে তাহা আমরা সহজে অনুভব করিতে পারি। তৃতীয়তঃ ইহুদি জাতি। ইহারা তখন পৃথিবীতে কেবল একেশ্বরবাদী ছিল। কিন্তু ইহাদিগের ধর্ম্ম, নানা নিয়ম ও কার্য্যকলাপে বদ্ধ থাকিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত সঙ্কীর্ণহৃদয় করিয়া তুলিয়াছিল। অন্য কোন জাতির সহিত ইহারা মিশিতে পারিত না। তাহারা যেমন অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগকে ঘৃণা করিত, অন্যধর্ম্মাবলম্বীরাও তেমনি তাহাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। ইহুদীদিগের ভিতর আর একটি বিষম রোগ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

তাহাদিগের শাস্ত্রে মেসাইয়া নামক এক জন পরিত্রাতা আসিবার কথা পাওয়া যাইত। সেই মেসাইয়া তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবেন এবং তিনি তাহাদিগের রাজা হইবেন ইহাও কথিত ছিল। ইহুদীরা অনেক কাল হইতে বিজাতীয়দিগের অধীনস্থ ছিল, তাহারা মনে করিত যে, মেসাইয়া তাহাদিগকে রোমরাজ্যের দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিবেন। যখন ঈশা আসিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন এবং আপনাকে ঈশ্বরপুত্র ও মেসাইয়া বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন ইহুদীদিগের স্বাধীনতার আশা অনেক গুণে বলবতী হইল। তাহারা মনে করিল যে, তবে বুঝি আমরা স্বাধীন হইতে পারিলাম; আর রোমের অধীন হইতে হইবে না। এই মনে করিয়া তাহারা নানামতে ঈশাকে প্রশ্ন করিতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারা যে কেবল নিরাশ হইল তাহা নহে, তাহাদিগের ক্রোধাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং যাহাতে ঈশা অবমানিত, লাঞ্ছিত এবং পীড়িত হন এই চেষ্টা করিল। তাহারা যাহা চাহিয়াছিল ঈশা তাহাদিগকে তাহার বিপরীত বস্তু দিয়াছিলেন। তাহারা পার্থিব রাজ্য চাহিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বর্গরাজ্য দিলেন। তাহারা ধন, মান, ক্ষমতা চাহিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বিশ্বাস, বিনয় এবং নির্ভয় দিলেন। তাঁহার স্বর্গরাজ্যের কথা তাহারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তিনি বলিলেন,—তাহারা স্বর্গরাজ্যের বড়লোক যাহাদিগের কিছুই নাই, কেহই নাই, যাহারা নিপীড়িত ও ঘৃণিত, যাহারা গরিব,

যাহাদিগের ইহকালে কোন সম্বলই নাই। তিনি বলিলেন যে এ রাজ্যে ধনীদিগের স্থান নাই। একটি উষ্ট্র সূচিকার ছিদ্রের মধ্য দিয়া যাইতে পারে তাহাও সম্ভব; কিন্তু ধনী লোক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিবে ইহা সম্ভব নহে। যাহারা কপট, অল্পবিশ্বাসী ও কার্য্যকলাপের অনুগত সেবক, তাহাদিগের সে রাজ্যে কোন প্রকার স্থান নাই। অনেকে বলিত যে বাহিরে ভাল থাকিলেই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি বলিলেন যে, মনে মনে এক জন স্ত্রীলোককে যদি কুভাবে দেখ, তাহা হইলে তুমি ব্যভিচার দোষে লিপ্ত হইলে। অনেকে বলিত যে দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু লওয়া যায়; কিন্তু তিনি বলিলেন যে, শত্রুদিগকে ভালবাস, যাহারা তোমাদিগকে নির্য্যাতন করে তাহাদিগের ভাল কর। ইহুদিরা এ কথা শুনিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। কেহই তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট রহিল না। ধনীরা তাঁহাকে ঘৃণা করিত, পুরোহিত দল তাঁহার প্রাণ লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, বিদ্বান্‌েরা তাঁহাকে তুচ্ছ করিল, পাপীরা তাঁহাকে বিষবৎ বিবেচনা করিল। অবশেষে ক্রোধ, হিংসা প্রতিহিংসা, অবমাননাবোধ, সকলপ্রকার পশুভাব আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনি নির্দ্দোষ মেষশাবকের ন্যায় শার্দ্দূলদিগের হস্তে পড়িলেন এবং বিনা দোষে প্রাণ দিয়া পিতা বলিতে বলিতে ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন।

বলিতে গেলে সমগ্র পৃথিবী তাঁহার বিরোধে দাঁড়াইয়াছিল।

রোম রাজ্যে তখন পরলোকসম্বন্ধে কোন বিশ্বাস ছিল না। ইহুদিরাও যে পরলোকের দিকে দৃষ্টি করিত তাহা বলা যায় না। ইহজীবনই সকলকার লক্ষ্য ছিল। এই পৃথিবী, ইহার বিলাস, ইহার রাজত্ব, ঐশ্বর্য্য, যশ এবং প্রতিপত্তি ইহাই লোকদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যখন ঈশা বলিলেন যে, ইহজীবন কিছুই নহে, ইহা স্বর্গরাজ্য হইতে বিভিন্ন, তখন লোকেরা নূতন কথা শুনিল বটে, কিন্তু তাহা শুনিয়া তাহারা সন্তুষ্ট হইল না। যে সকল পদার্থ লোকে ভাল বলিত, তিনি সেই সকলই মন্দ বলিলেন। তাহারা যাহা চাহিত, তিনি তাহাই ছাড়িতে বলিলেন। সুতরাং কেহই তাঁহাকে ভালবাসিল না। রাজপুরুষেরা তাঁহাকে ঘৃণা করিত, যে হেতু তিনি নবরাজ্যের প্রতিষ্ঠার সমাচার সকলকে দিয়াছিলেন। সে রাজ্যে ধনী, বলবান, প্রমত্ত, স্বার্থপর কাহারও স্থান নাই; বরং যাহারা এ জীবনে অতিশয় ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত এবং যাহাদিগের উপর বলবানেরা সর্ব্বদা অত্যাচার করে, তাহারাই এই রাজ্যে শ্রেষ্ঠ পদের অধিকারী। ইহাতে রাজপুরুষেরা তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন না ত কি? রোমের পুরোহিত দল তাঁহাকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত, যেহেতু তিনি প্রতিষ্ঠিত দেবদেবী সকলকেই মিথ্যা বলিয়া প্রচার করিলেন। ইহাতে তাহাদিগের অন্ন, খ্যাতি, প্রতিপত্তি সকলই গেল। যত শীঘ্র এ পাপ পৃথিবী হইতে বিদায় হইয়া যায় ততই মঙ্গল এই কামনা তাহারা করিতে লাগিল। ইহুদি পণ্ডিত ও দার্শনিকেরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত

হইল, কেননা তিনি তাহাদিগকে কপট ও ভ্রান্ত বলিয়া প্রচার করিলেন এবং আপনাকে ঈশ্বর-সন্তান বলিয়া নির্দেশ করিলেন। ইহুদি জাতি কঠোর একেশ্বরবাদী ছিল। ঈশ্বরের পদ যদি কেহ কামনা করিত, তাহা হইলে তাহারা তখনই তাহাকে প্রাণদণ্ড দিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। ঈশা ঈশ্বর-সন্তান পদ লইয়া ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিলেন এইজন্য তাহারা তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। তাহারাই তাঁহাকে ক্রুশে আরোহণ করাইল। এতদ্ব্যতীত ইহুদিদিগের অন্য সকলে তাঁহার কথা শুনিয়া ঘোর নিরাশার অবস্থাতে পড়িল। তাহারা এমন এক রাজা চাহিত যে রাজা তাহাদিগকে স্বাধীনতা দিবে, যাঁহার বলে তাহারা রোমীয়দিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া স্বতন্ত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবে। যখন ঈশা আপনাকে স্বর্গরাজ্যের রাজা বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন ইহুদিরা তাঁহার কাছে একটি রোমরাজের মুদ্রা উপস্থিত করিল। এ মুদ্রা তাহারা সম্রাটকে দিবে কি না? সে মুদ্রা রোমের; রোমের মুদ্রা স্বীকার করিলেই দাসত্ব স্বীকার করা হইল। কিন্তু ঈশা যদি রাজা হন, তাহা হইলে তাঁহার নিজের নামে মুদ্রা অঙ্কিত হওয়া উচিত। কিন্তু তিনি যখন এই প্রশ্ন শুনিলেন, তখন তিনি কি উত্তর দিলেন? "কাইশারকে কাইশারের জিনিস দাও, এবং ঈশ্বরকে ঈশ্বরের জিনিস দাও।"

ইহার অর্থ এই যে, স্বর্গরাজ্য এবং পার্থিব রাজ্য দুটী

স্বতন্ত্র। মুদ্রা পৃথিবীর পদার্থ, ইহা স্বর্গের নহে। যিনি পৃথিবীর সম্রাট পৃথিবীর মুদ্রা তাঁহার প্রাপ্তব্য। কিন্তু স্বর্গ-রাজ্যের রাজা সে মুদ্রা লইয়া কি করিবেন? অতএব পৃথিবীর পদার্থ পৃথিবীপতিকে দাও। স্বর্গাধিপতি অন্যপ্রকার কর গ্রহণ করেন। তাহা টাকা নহে, কড়ি নহে, কোন প্রকার সম্পত্তি নহে। স্বর্গের ধন স্বর্গের রাজাকে দিতে হইবে। ঈশার মুখে এ কথা শুনিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হইল, এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহারা তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল; যাহারা ধনী বলিয়া অহঙ্কার করিত তাহারা তাঁহার নির্ধন রাজ্যের বিরোধী হইল। যাহারা পবিত্র বলিয়া ভাণ করিত তাহারা তাঁহার বিশুদ্ধ নীতির নিকট লজ্জিত হইল। যাহারা ঘোর পাপী ছিল তাহারা তাঁহাকে সহ করিতে পারিল না। কেন না পাপীদিগের সম্মুখে পুণ্যশিশু উপস্থিত হইলেই তাহারা তাঁহাকে আক্রমণ করিবেই করিবে। পাপীর নিকট পাপী আনয়ন কর তাহারা তাহাকে আদর করিবে। কিন্তু একজন পুণ্যবানকে আন, তাহারা তাঁহাকে মারিতে মারিতে বিদায় করিয়া দিবে। একজন সুরাপান করেন না, তিনি যদি একদল সুরাপায়ীর নিকট কেবলমাত্র উপস্থিত হন আর কিছু না, বলেন সুরাপায়ীরা তাঁহাকে সহ্য করিতে পারিবেনা। তিনি কিছু না করিলেও, না বলিলেও, নিস্তব্ধভাবে যেন তাহাদিগকে ভৎসনা করিতেছেন। ঈশা নির্দ্দোষ, পাপশূন্য, বিশুদ্ধ আত্মা; আর তখনকার লোকেরা ঘোর ব্যভিচারী,

বিলাসী, অস্বাভাবিক পাপে কলুষিত। তিনি তাহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলেন এই বর্ত্তমান থাকাই যেন তাহাদিগের ঘোর অপমানস্বরূপ হইল। তাঁহার মুখ হইতে পুণ্যছটা বাহির হইতেছে, তাঁহার কথা অমৃত ক্ষরণ করিতেছে, তাঁহাকে "ক্রুশে দাও !" এই রব চারিদিকেই হইতে লাগিল। আহা ! পাপ যেন পুণ্যকে মারিতে মারিতে পৃথিবী হইতে তাড়াইয়া দিল। ঈশা ধন্য, কেন না তিনি দুর্ব্বলতার বল দেখাইয়া গেলেন। যে লোকের কেহই ছিল না, কিছুই ছিল না, সেই লোক লাঞ্ছনা খাইয়া, গঞ্জনা খাইয়া, নিপীড়িত হইয়া, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, কি দেখাইলেন ? সত্যের আশ্চর্য্য মহিমা, বিনয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা, নির্ধনতার অনন্ত ঐশ্বর্য্য, নির্ভরের বিচিত্র ফল। পৃথিবীতে ধনীদিগের পরাক্রম ত হইবেই হইবে, সম্রাটের অসীম ক্ষমতা ত থাকিবেই থাকিবে, কিন্তু একজন তৃণসমান লোকের ভিতর দিয়া অনন্ত ক্ষমতা কিরূপে বাহির হয় ইহা ঈশ্বর ঈশার জীবন দিয়া দেখাইয়াছিলেন। সম্রাট একজন যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাঁহার ক্ষমতা থাকে। তাঁহার মরণের পর কয় জন তাঁহার নাম করে ? কিন্তু সামান্য সূত্রধরের সন্তান ঈশা অবমাননার ভিতর হইতে যে যে কথা বলিয়া গিয়াছেন তাহা আজও জ্বলন্ত স্ফুলিঙ্গের ন্যায় পৃথিবীকে দগ্ধ করিতেছে। যে লোককে সেই সময়কার ইহুদিয়া পদাঘাত করিয়া, প্রহার করিয়া, অঙ্গে থুৎকার দিয়া পরকালে পাঠাইয়াছিল

আজ বড় বড় সম্রাট সেই ঘৃণিত লোকের চরণতলে নিপতিত দাস। যাহাকে ঘৃণা করিত তাহাকে আজ লোকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। লীলাময় হরি লীলা দেখাইতে দেখাইতে কিনা করিতে পারেন? তাঁহার বলে অসম্ভব সম্ভব হয়।

আমরা বলিয়াছি যে ঈশার ভিতর অনন্তভাব সকল সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এ তত্ত্ব আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন লোকেরা পৃথিবী লইয়াই থাকিত এবং পৃথিবীর সম্ভোগকেই তাহাদিগের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া লইয়াছিল। স্বার্থসাধন জীবনের উচ্চ আদর্শ ছিল। বিলাস, বাসনা, প্রভুত্ব, স্বেচ্ছাচারিতা, এই সকল তাহাদিগের লক্ষণ ছিল। তখনকার দেবদেবীরা মানুষের ন্যায় হিংসা, ক্রোধ, নির্যাতন, ও রিপুসেবার বশীভূত ছিল। রোমের সম্রাটও লোকের পূজ্য হইয়াছিলেন। স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে এক প্রকার অনন্ত ব্যবধান ছিল। ঈশা এই ব্যবধানটি নষ্ট করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি পরম পিতাকে প্রচার করিতে আসিলেন এবং সেই পিতার নিকট যাইবার পথ পুত্রত্ব এই নূতন সমাচারটী পৃথিবীতে আনিলেন। পিতা বলিয়া যে একজন অনন্তপুরুষ আছেন ইহা কেহই জানিত না। সুতরাং তিনি প্রথমেই পিতা আছেন এই সংবাদটী লোককে দিলেন। কিন্তু পিতা থাকিলে কি হইবে, পিতার নিকট না যাইতে পারিলে পিতৃত্ব লইয়া লোকে

কি করিবে ? সেই জন্য তিনি বলিলেন যে সেই পিতার নিকট, পুত্রত্ব দিয়া পৌঁছান যায়। ইহার অর্থ কি ? অর্থাৎ পিতা এবং আমাদিগের মধ্যে প্রকাণ্ড ব্যবধান আছে। প্রকাণ্ড সাগরের ন্যায় সেই ব্যবধান। সে ব্যবধানটীর নাম স্বেচ্ছা। আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে কেবল স্বেচ্ছার জন্য পৃথক্ হইয়া আছি। অর্থাৎ প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার ইচ্ছামত চলি না। নিজ ইচ্ছামত কার্য্য করাই আমাদিগের পাপ। আমরা তাঁহাকে চাহি না, "আমাকে" চাই। আমার রুচি, আমার তৃপ্তি, আমার সম্ভোগ, আমার বিলাস, আমার কামনা—আমরা এইরূপ কেবল 'আমার, আমার' করিয়া মরি। এই "আমি," "আমার" ইত্যাদি ঈশ্বর হইতে আমাদিগকে দূরে রাখিয়াছে যতদিন "অহং" আমাদিগের মধ্যে রাজত্ব করিবে, ততদিন আমরা ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিব, আর যে মুহূর্ত্তে তাহাকে বিসর্জ্জন দিব, সেই মুহূর্ত্তেই আমরা ঈশ্বরকে পাইব। ঈশা এই স্বেচ্ছাত্যাগ জগতে প্রচার করিলেন। তিনি বলিলেন—"তোমাদিগের পিতা সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর। তোমরা তাঁহাকে জান না, তাহার কারণ এই যে তোমরা পুত্রভাবে জীবন যাপন কর না। প্রকৃত পুত্র হও, পিতার আজ্ঞা পালন কর, স্বেচ্ছাত্যাগ করিয়া অনুগত হও, তাহা হইলে তোমরা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবে।" ঈশা ঈশ্বরপুত্র হইয়া আপনার পরিচয় দিলেন। তিনি বিবাহ করেন নাই, থাকি-

বার একটী খাটী পর্য্যন্ত তাঁহার ছিলনা। অর্থ সংস্থান কিছুই নাই। তিনি কাল কি খাইবেন তাহা জানিতেন না। কিন্তু তিনি জানিতেন যে তাঁহার ঈশ্বর বলিয়া পিতা আছেন। তিনি তাঁহাকে বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। বিড়াল যেমন বিড়ালশাবককে মুখে করিয়া এস্থান হইতে ওস্থানে লইয়া যায় অথচ বিড়ালশাবক অন্ধ হইয়া সম্পূর্ণরূপে মাতার স্নেহের উপর নির্ভর করে, তেমনি ঈশা পিতার উপর অন্ধভাবে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। পিতা তাহাকে থাকিবার স্থান দিবেন, পিতা তাঁহাকে খাওয়াইবেন, পিতা তাঁহাকে পরাইবেন। পক্ষীরা কি কল্যকার জন্য সংস্থান করে? তাহারা কি পরিধান বস্ত্রের জন্য লালায়িত হয়? কখনই নহে। অথচ দেখ, প্রতিদিন যথাসময়ে তাহারা খাদ্য এবং আরামের স্থান পায়। যাহারা কিছুই ভাবে না তাহাদিগের অন্নসংস্থান সর্ব্বাগ্রে হয়, এবং তাহাদিগের বেশভূষা সম্রাটের বেশভূষা অপেক্ষা সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী। এই ভাবেই ঈশা থাকিতেন। তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই ছিল না। আমার পরিবার, আমার গৃহ, আমার ধন, আমার স্বজন এরূপ কথা তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত না। তাঁহার নিজের ইচ্ছা পূর্ব্বেই ছিল না। যাহা করেন প্রভু পিতা, তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। এই ভাবে তিনি সংসারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। স্বেচ্ছাত্যাগ করিয়া তাঁহার কি হইল?

আমরা দেখিয়াছি যে শাক্যসিংহ বাসনাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়াই বুদ্ধ হইলেন। যে মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় হইতে এই অগ্নি নির্ব্বাণ হইয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ হইল এবং বিশুদ্ধ নীতি তাঁহার জীবনের আদর্শ হইল। আমরা দেখিয়াছি যে সক্রেটিস্ আপনাকে অজ্ঞান বলিয়া জানিতে পারিয়াই প্রকৃত জ্ঞানী হইলেন। যে মুহূর্ত্তে তিনি দেববাক্য সত্য ইহা বুঝিতে পারিলেন, সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার হৃদয় দয়াতে পূর্ণ হইল। তিনি লোকদিগকে অহঙ্কার হইতে মুক্তি দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার মুখ হইতে দেববাক্য নির্গত হইতে লাগিল। ঈশাও ইচ্ছাত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার জীবনে আধ্যাত্মিক প্রকৃতির আর একটি অদ্ভুত নিয়ম সংসাধিত হইল। অন্তর শূন্য হইলেই দেবভাব আসিয়া হৃদয়কে পূর্ণ করে। বুদ্ধের সম্বন্ধে ইহা সত্য দেখিয়াছি, সক্রেটিস্ সম্বন্ধেও ইহা সত্য। মহাপুরুষ ঈশার পক্ষেও এই নিয়ম খাটিল। যাঁহার নিজ ইচ্ছা রহিল না, তাঁহার ভিতর দিয়া পিতার ইচ্ছা সকল পালিত হইল। তাঁহার মুখ দিয়া অনন্ত রাজ্যের কথা বাহির হইল। সত্য, জ্ঞান, পবিত্রতা, ক্ষমা, বিশ্বাস—এই সকল দেবভাব তাঁহার মুখ হইতে প্রকাশিত হইল। তাঁহার আপনার কথা বলিবার কিছুই ছিল না, ঈশ্বর নিজ কথা তাঁহার মুখ দিয়া বলাইয়া লইলেন। পূর্ণ প্রত্যাদেশ, স্বেচ্ছাত্যাগ ও আত্মসমর্পণ হইলেই হয়। যেখানে রাগ আছে, হিংসা

আছে ও প্রভুত্ব করিবার ইচ্ছা আছে, সেখানে প্রত্যাদেশ হয় এ কথা বলা বিষম ভ্রম। সেই হৃদয়ে পূর্ণ ব্রহ্ম প্রকাশিত হন, যে হৃদয়ে "আমি" ও "আমার" বলিয়া কোন কথা নাই। এই জগতে ছুইটি প্রবল শত্রুর মধ্যে অনন্ত বিবাদ চলিতেছে দেখা যায়। সে ছুই জন শত্রু ঈশ্বর এবং আমি। সর্ব্বশক্তি-মান পরমেশ্বর আপন ইচ্ছামতে সমুদয় ত্রিভুবন চালাইতে-ছেন। জড় জগত তাঁহার নিয়মে চালিত হইতেছে এবং স্বর্গের সাধুরা তাঁহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। কেবল মানুষকে তিনি স্বাধীন ইচ্ছা দিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়া-ছেন। এই স্বাধীন-ইচ্ছা বিকৃত হইলেও অহং বলিয়া পরিচিত হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা— এই ছুই ইচ্ছার মধ্যে চিরকাল সংগ্রাম চলিতেছে। ঈশ্বর বিবেক দিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন,—তুই এই কার্য টা কর্।"আমি" বলিতেছে—আমি করিব না। ঈশ্বর বলিতেছেন, তুই আমার ইচ্ছার অধীনে থাকিয়া আমার নিকটে আয়। 'আমি' বলিতেছে,—আমি 'আমার ইচ্ছামত কার্য্য করিয়া আমাতেই থাকিব এবং তোমা হইতে দূরে রহিব। এই ছুই ইচ্ছাতে কখনই মিল হইবে না এবং যত দিন ইহাদিগের প্রভেদ থাকিবে, ততদিন পাপপুণ্য, জীবাত্মা পরমাত্মা, স্বর্গ নরক—ইহাদিগের মধ্যে সংগ্রাম চলিবে। কিন্তু পিতা কখন পুত্রকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। সৃষ্টি হইতে তিনি কেবল দেখিতেছেন কিসে তাঁহার

দুরস্থ সন্তানেরা তাঁহার নিকটস্থ হয়। এই জন্য তিনি মনুষ্যদিগের অজ্ঞান অন্ধকার সর্ব্বদাই দূর করিয়া দিতে যত্নবান আছেন। যুগে যুগে তিনি মহাপুরুষদিগকে পাঠাইয়া নূতন নূতন সত্য প্রচার করিতেছেন। সেই মহাপুরুষদিগকে লইয়া তাঁহার নবলীলা সম্পাদন করিতেছেন। স্বর্গ এবং পৃথিবী এই দুই স্থানের মধ্যে অনন্ত ব্যবধান আছে। তিনি সেই ব্যবধানটী নষ্ট করিবার জন্য মহাপুরুষদিগকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা পৃথিবীতে আসিয়া বলেন যে স্বর্গমর্ত্ত্যের ব্যবধান আর কিছুই নহে কেবল প্রতি লোকের অহং জ্ঞান। স্বার্থসাধন পৃথিবীর ধর্ম্ম, নিঃস্বার্থ ভাব স্বর্গের পদার্থ। এই স্বেচ্ছারূপ ব্যবধান কাটিলেই স্বর্গ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয় এবং পৃথিবী স্বর্গের দিকে আরোহণ করে। অতএব এই স্বেচ্ছাকে কাট। এই স্বেচ্ছা দুই স্থানকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই স্বেচ্ছা মানুষকে ঈশ্বরের নিকট হইতে অনেক দূরে রাখিয়াছে। ঈশা আসিয়া বলিলেন,—এই স্বেচ্ছাকে নষ্ট কর। আপনার বলিয়া আর কিছুই রাখিও না। যাহা করিতে হয় তাহা ভগবান্ করিবেন, তোমার বলিবার কিছুই থাকিবে না। যদি এই ব্যবধানটি নষ্ট কর, তাহা হইলে দেখিবে যে ঈশ্বর আর দূরে থাকিবেন না। তিনি তোমার হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি ঈশ্বরকে আত্মস্থ করিয়া তদ্‌গত হইয়াছ। আর তোমার কথা মুখ দিয়া বাহির হইতেছে না; ঈশ্বর নিজে

কথা কহিতেছেন। তোমার চক্ষু দিয়া ঈশ্বর দেখিতেছেন, অর্থাৎ তুমি তাঁহাকে ছাড়া আর কাহাকেও দেখিতেছ না। তোমার কর্ণ দিয়া তিনি শুনিতেছেন; অর্থাৎ তুমি তাঁহার কথা ছাড়া আর কিছুই শুনিতেছ না। ঈশ্বর বাহিরে ও অন্তরে; চারিদিক ঈশ্বরময় হইয়াছে। পিতা পুত্র এক হইয়াছেন। আর দ্বিধা নাই। আর দুইটি পুরুষ নাই। ঈশা বলিতে পারেন, আমি এবং আমার পিতা একই। ইহার অর্থ নহে যে ঈশা ঈশ্বর। না। পিতা পুত্র এক হইয়াছেন, অর্থাৎ পুত্রের আর ইচ্ছা নাই। পিতার ইচ্ছা পুত্রের হইয়াছে। সুতরাং যে ইচ্ছা দুইজনকে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, সেই ইচ্ছা বিনষ্ট হইয়া পিতার ইচ্ছাতে পরিণত হইয়াছে। দেখ, কি সুন্দর নিয়ম ঈশা জগতে প্রচার করিলেন। পৃথিবীতেই দেখি যে, যে পুত্র পিতার সঙ্গে বিদ্রোহিতা করে সে পুত্র অধম পুত্র বলিয়া নাম ধারণ করে; কিন্তু যেখানে পিতাপুত্রের একই ইচ্ছা, সেখানে কত পারিবারিক কুশল, কত সাংসারিক মঙ্গল বিরাজ করে। ধর্ম্মরাজ্যে এই নিয়মের অনেক অর্থ আছে। মনে কর আমরা বিদ্রোহী হইয়া, স্বেচ্ছাসাধন করিয়া, কত অশান্তি, কত পাপের কারণ হইয়াছি। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে পিতা পুত্র এক হইলেন, দেখ অশান্তি গেল, রাশি রাশি পাপশৃঙ্খল একেবারে খসিয়া পড়িল, সুখী পরিবার জগতে অবতীর্ণ হইল। ধন্য ঈশা! তুমি ভগবানকে পাপীর হৃদয়ে আনিয়া দিলে।

যে ভগবান্‌কে যুগে যুগে কেহ পায় নাই, তাঁহাকে তুমি সহজে পাপীর করতলন্যস্ত করিয়া দিলে। পৃথিবী কি কখন তোমারি ধার পরিশোধ করিতে পারিবে ?

সক্রেটিস্‌ অজ্ঞানশাস্ত্র প্রচার করিয়া বলিলেন যে, যে লোক কিছুই জানে না তাহার মুখ দিয়া "ডিমন্‌" নামে এক দৈবশক্তি কথা কহে। সক্রেটিসের প্রধান শিষ্য প্লেটো ইহা হইতে "লোগস্‌" শাস্ত্র প্রচার করিলেন। "লোগস্‌" ইহার অর্থ শব্দ অথবা জ্ঞান। যে কিছুই জানে না তাহার অন্তর হইতে এই শব্দ নির্গত হয় ; অনন্ত জ্ঞানের শব্দ নির্গত হয়। ঈশা যখন ইচ্ছারূপ যোগশাস্ত্র প্রচার করিলেন, তখন তাঁহার প্রধানতম শিষ্য জন প্লেটোর "লোগস্‌" কথাটি অবলম্বন করিয়া ঈশাকেই "লোগস্‌" বলিয়া প্রতিপন্ন করিলেন। অর্থাৎ যে পুত্র স্বাধীন ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া পিতার সহিত এক হইয়াছেন তাঁহার অন্তর হইতে যে ধর্ম্ম, যে জ্ঞান, যে শব্দ নির্গত হয় তাহা অনন্ত পিতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। দেখ, ভিন্ন ভিন্ন বিধানে কেমন সমন্বয় হইল। জন প্লেটোর সাহায্যে ঈশাকে বুঝাইলেন। ইহা আশ্চর্য্য নহে। কেন না আমরা বলিয়াছি যে এক মনুষ্য মনের তিনটি বিভাগকে তিনজন মহাপুরুষ স্বর্গের দিকে উঠাইবার ভার লইয়াছিলেন। বাসনা নির্ব্বাণ করিয়া বুদ্ধ অনন্ত দয়া এবং নীতির অধিকারী হইয়াছিলেন। অহঙ্কার বিনাশ করিয়া সক্রেটিস্‌ অনন্ত তত্ত্ব গ্রহণ করিবার উপযুক্ত

হইয়াছিলেন। এবং স্বেচ্ছা নাশ করিয়া ঈশা পিতাপুত্রের একত্ব সংস্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। এক মনের তিনটী বিভাগ; এবং তিনটী বিভাগের এক শাস্ত্র। বাসনা, জ্ঞানাভিমান, স্বেচ্ছা এই তিনটী তিন প্রকারের মানসিক পাপ। ইহাদিগকে বিনাশ করিলেই কি হইবে? এই হইবে যে অনন্ত আত্মা জীবাত্মার মনে অবতীর্ণ হইয়া, স্বর্গমর্ত্তের ভেদাভেদ নষ্ট করিবেন। এই তিনটী দিক না ধরিলে আমরা নববিধানের পথে আসিতে পারিব না।

একেশ্বরবাদ—মহম্মদ।

উচ্চ ধর্ম্মের পথ এই বারে পরিষ্কৃত হইল। ঈশ্বর এবং মনুষ্যের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা এক প্রকার নষ্ট হইল। কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে সুবিধা হইল না। আমরা দেখিয়াছি যে মন শূন্য করিলেও ঈশ্বর সম্বন্ধে গোলমাল থাকিতে পারে। বুদ্ধের নীতি গ্রহণ করিতে হইলে ঈশ্বরকে না জানিলেও চলে। বোধ হয় অর্দ্ধেক বৌদ্ধেরা ঈশ্বরকে মানে না। সক্রেটিস প্রকৃত জ্ঞানী হইলেও তিনি গ্রীক দেব দেবীদিগকে মানিতেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছে বলিয়া ঈশাই ধর্ম্মকে ঠিক একেশ্বরবাদ বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাহারা ত্রিনৌক্তিবাদ মানিয়া প্রকৃত একেশ্বরবাদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিল। খ্রীষ্টানেরা ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা "একে তিন, তিনে এক" এই মতটি দিয়া এক প্রকার পৌত্তলিকতা

হইতে রক্ষা পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা হইলেও এটী স্বীকার করিতে হইবে যে তাঁহারা ঈশাকে ঈশ্বর বলেন। কি প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া ঈশাই ধর্ম্মযাজকেরা একজন মনুষ্যের উপর ঈশ্বরত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা আমরা বলিতে পারি না। তবে ঈশা নিজে বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর পিতা, তিনি পুত্র। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে পুত্র কি কখন পিতা হইতে পারেন ? তবে ঈশা কিরূপে ঈশ্বর হইবেন ? ঈশা ঈশ্বরপুত্র,—এটী আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু তিনি ঈশ্বর এ কথাটি তাঁহার বচনাবলি হইতে কোনমতে পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টান ধর্ম্মে এই ভয়ানক মনুষ্যপূজাপদ্ধতি আসাতে পরে অনেক ক্ষতি হইয়াছিল। ক্রমে ঈশার জননী মেরির পূজাও আরম্ভ হইল, এবং ক্রমে মূর্ত্তিপূজার ও সূচনা হইল। ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে এই সকল ভ্রমাত্মক মত আসিয়া ঈশাই ধর্ম্মকে একপ্রকার পৌত্তলিকতাতে পরিণত করিয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আর একবার ভেরিরবে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হওয়া আবশ্যক হইল, মনুষ্য সমাজে এ বিষয়ে অভ্রান্ত সমাচার বিজ্ঞাপিত হওয়া উচিত হইল। আর একজন মহাপুরুষের জগতে অবতীর্ণ হইবার সময় আসিল। একেশ্বরতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য ভগবান্ এমন একটি দেশ বাছিয়া লইলেন যেখানে পৌত্তলিকতার অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল এবং যেখানে অসভ্যতা এবং নিষ্ঠুরতার ঘোর আধিপত্য ছিল। সে দেশটী আরবদেশ।

আরবজাতি ইহুদীদিগের সঙ্গে একবংশোদ্ভব। ইহুদীরা আবহমানকাল পর্য্যন্ত একেশ্বরবাদী ছিল। এখন তাহাদিগের কুটুম্ব আরবদিগেরও সেই মত হওয়া আবশ্যক হইল। মহম্মদ একজন আরব। তিনি স্বজাতীয়দিগকে পৌত্তলিকতা হইতে পরিত্রাণ করিয়া একেশ্বরবাদে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথা ঈশার প্রথা হইতে অনেক বিভিন্ন। ঈশা প্রেম দিয়া, প্রাণ দিয়া, শত্রুকে ক্ষমা করিয়া নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু মহম্মদের পক্ষে প্রেম দেখাইয়া তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে বশীভূত করা অসম্ভব কার্য্য হইল। ঈশ্বর এক সত্য জীবন্ত ব্রহ্ম, এই জ্বলন্ত বিশ্বাস তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল। তিনি দেখিলেন যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়েও মূর্ত্তিপূজা উপস্থিত হইয়াছে। আর তাঁহার আপনার দেশের ত কথাই নাই। মিথ্যা কথা, মিথ্যা মত, মিথ্যা দেব দেবী এই সকল দেখিয়া তাঁহার বিশ্বস্ত হৃদয় অধীর হইয়া পড়িল। ঈশ্বর এক এইটি সত্য; ঈশ্বর অনেক এইটি ভয়ানক মিথ্যা কথা। পৌত্তলিকেরা পরব্রহ্মকে অপমান করিতেছে, তাঁহার রাজত্বকে অপহরণ করিতেছে ইহা তিনি দেখিতে পারিলেন না। বার বার মহাপুরুষেরা আসিয়াও একেশ্বরবাদ স্থাপন করিতে পারেন নাই। জগত নিদ্রাবস্থায় পতিত হইয়া ভ্রমসমূহকে প্রশ্রয় দিতেছিল। লোকেরা স্বর্গ হইতে যে সমাচার আসিয়াছিল তাহাতে বধির হইয়াছিল। হুঙ্কাররবে সেই বধিরতা নষ্ট

করিতে হইবে। বজ্রধ্বনিতে সেই নিদ্রাকে ভঙ্গ করিতে হইবে। নির্দ্দোষ পক্ষীদিগের কুহুধ্বনিতে একথা লোক-দিগের কর্ণে প্রবেশ করিবেনা। স্বর্গ হইতে কপোত আসিলে লোকে তাহাকে দেখিতে পাইবেনা। হুঙ্কাররব, বজ্রধ্বনি, অস্ত্রশস্ত্রের তর্জ্জন গর্জ্জন এই সকল ভয়ঙ্কর শব্দ না উঠিলে জনহৃদয় বিকম্পিত হইবেনা, ব্রহ্মমহিমা ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিবে না। অগ্নিবর্ষণ করিতে হইবে, মুখ হইতে ব্রহ্মতেজ নির্গত হওয়া আবশ্যক। জ্বলন্ত উৎসাহ, নির্ভীক হৃদয়, অচল বিশ্বাস, দোর্দ্দণ্ডবীর্য্য, ভ্রম ও কুসংস্কারের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণা—এই সকল অস্ত্র লইয়া মহম্মদ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার দেশের লোকেরা তাঁহাকে মানিল না, তাঁহার দিকে চাহিল না। তিনি ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্ হইয়া, প্রবল বিশ্বাস দ্বারা সকল শত্রুকে পরাজিত করিলেন। অসংখ্য প্রস্তর খণ্ড, অসংখ্য দেবদেবী, ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। কুসংস্কার আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল; তাঁহার বিক্রমে সেই আকাশ পরিষ্কার হইয়াগেল। এতদিন পরে জগত পরিষ্কাররূপে শুনিতে পাইল যে ঈশ্বর এক। আর কেহ মিথ্যা যুক্তি দিয়া বহু দেবদেবীর পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবে না, যে হেতু ঈশ্বর-দূত মহম্মদ আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে ঈশ্বর এক।

ইস্লাম হইতে অনেক যুদ্ধ ও রক্তপাত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মহম্মদের ধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়াই স্বীকার করেন না।

তাঁহাদিগের মতে মহম্মদ যে নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা কথা। আমরা কিন্তু এমতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে ধর্ম্ম সমাজে উচ্চ শ্রেণীর সাধক ও পুণ্যবান পুরুষ জন্মাইতে পারেন সে সমাজের ধর্ম্ম কখনই সর্ব্বৈব মিথ্যা হইতে পারে না। মৃত ধর্ম্মহইতে জীয়ন্ত ভক্ত জন্মগ্রহণ করিতে পারে না। পৃথিবীতে মহম্মদীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা অধিক হইবে। ইহা কি সম্ভব যে এত লোক সহস্রাধিক বর্ষ ধরিয়া এক মৃত দেহের চর্ব্বিত অস্থি ও চর্ম্ম চর্ব্বণ করিয়া পুষ্টকায় হইয়া রহিয়াছে ? কখনই নহে। সেই মুশা ঈশার কত বৎসর পূর্ব্বে জিহোবাকে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাহার পর সহস্রাধিক বৎসর পরে পৃথিবীকে বিষম ভ্রমনিদ্রা হইতে জাগরিত করিবার জন্য মহম্মদ স্বর্গ হইতে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার মুখে আর কোন কথা ছিল না কেবল "ঈশ্বর এক, এবং মহম্মদ তাঁহার প্রেরিত।" অনেকে বলেন যে মহম্মদ বহুবিবাহ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, তিনি স্বর্গের আধ্যাত্মিক ভাব দেখাইতে পারেন নাই, তিনি ক্রীতদাস পদ্ধতিকে নিয়মাধীন করিয়াছেন, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আমরা বলিতেছি এই যে তিনি সমাজসংস্কারক হইয়া পৃথিবীতে আসেন নাই। রাজনীতি সংশোধন করা তাঁহার কার্য্য ছিল না। জগতকে পৌত্তলিকতার বিভীষিকা হইতে রক্ষা করাই তাঁহার বিশেষ কার্য্য ছিল। সেই কার্য্য করিতে গিয়া যতদূর সমাজ ও

রাজনীতি সংস্কারকরার আবশ্যকতা হইয়াছিল তাহা তিনি করিয়াছিলেন। যখন বিবেচনা করি যে আরবদিগের মধ্যে অনেক স্ত্রী বিবাহ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন মহম্মদ যে সেই সংখ্যা কমাইয়া দিলেন ইহাতে সভ্যতার রাজ্যে অনেক পদ অগ্রসর হওয়া হইল তাহার কোন সন্দেহ নাই। যখন ক্রীতদাসপ্রথা ১৮৬০ খ্রীঃঅব্দ পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান সম্প্রদায়দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, তখন অসভ্য আরবদিগের মধ্যে দাস ক্রয় বিক্রয় করা মহাপাপ এ জ্ঞানটি যে হইবে ইহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। মহম্মদ যথাসাধ্য সেই প্রথাতে যে নিষ্ঠুরতা প্রশ্রয় পাইত তাহা নিয়মদ্বারা বিনাশ করিতে পারিয়াছিলেন। আর তৎকৃত স্বর্গের ছবির বিষয় যে সকল নিন্দা পড়িতে বা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পৃথিবীর সকল ধর্ম্মেই পরকালবিষয়ক কল্পনার ছবি ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যায় না। কোন কোন ছবি ঘোর জড়তাসম্ভূত; কোন কোনটাতে বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু স্বর্গ বলিয়া যে স্থানটি সকল ধর্ম্মে বর্ণিত আছে তাহাকে জড়জগতের একটি বিস্তৃত অংশ ভিন্ন আর কিছু বলিয়া বোধ হয় না। মহাপুরুষেরা যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখন যে সকল ভাব, চিন্তা ও অনুশীলন প্রচলিত থাকে তাহাদিগকে তাঁহারা অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে সেই সময়কার দোষ গুণের এক প্রকার প্রতিনিধি বলিলেও বলিতে পারা যায়। কেবল যে একটি কথা স্বর্গ হইতে

লইয়া আসেন সেইটি তাঁহাদিগের। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল কথা সেই সময়কার। তাঁহাদিগের নিজকথার বলে যতটা পাপ দূর হইতে পারে তাহা হয়। যে পাপ দূর করিবার জন্য তাঁহারা প্রেরিত হন তাহাত বিনষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত যে সকল পাপ উক্ত পাপের সহিত দূরতর বা নিকটতর ভাবে সম্বদ্ধ তাহাও অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। মনে কর আরবেরা কি ভয়ানক অসভ্যজাতি ছিল। অজ্ঞান, কুসংস্কার পাপ অত্যাচার প্রভৃতি যত প্রকার দোষ অসভ্যদিগকে কলুষিত করিতে পারে তাহা তাহাদিগের ছিল। মনে কর দেখি যদি সেই আরবেরা মহম্মদের ধর্ম্ম না পাইয়াই এদেশ অধিকার করিত তবে আমাদিগের অবস্থা কি ভয়ানক হইত। আমাদিগকে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হইত; কত প্রকারে আমাদিগের জাতীয় গৌরব লাঞ্ছিত হইত। কিন্তু সেই আরবেরা নবধর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া, নবতেজ ধারণ করিয়া নববিদ্যাপ্রদীপ হস্তে লইয়া পৃথিবীর অন্ধতম দেশে সত্যের জ্যোতি, জ্ঞানের জ্যোতি বিকাশিত করিতে পারিয়াছিল। যখন ইউরোপ ঘোর অন্ধকারে আবৃত ছিল, তখন আরবেরা বিদ্যালোক চারিদিকে প্রচার করিয়াছিল। আরবেরাই এখনকার ইউরোপীয় সভ্যতার সূত্রপাত করে। মহম্মদ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি পৃথিবীকে অনেক পাপভার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। আমাদের তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করা উচিত।

ভক্তিশাস্ত্র-চৈতন্য।

আমরা দেখিতেছি যে ঈশ্বরপূজার সকল আয়োজন প্রস্তুত। যুগে যুগে একটি একটি ভাব আসিয়া প্রকৃত ধর্ম্মমন্দিরকে সম্পূর্ণ করিতেছে। ঈশ্বর পিতা বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হইলেই পিতাপুত্রের একত্ব হইল। কিন্তু এখনও হৃদয়ের সকল অভাব মিটিলনা, একটা যেন কোথায় শূন্যস্থান আছে। সেটী পূর্ণ না হইলে প্রকৃত সম্ভোগ হইল না। ধর্ম্ম এত দিন কেবল কঠোর ভাবে মনুষ্যের নিকট সমুপস্থিত হইয়াছে। ঘোর তপস্যা; কঠোর সাধন, ইচ্ছা না থাকিলেও সকল প্রকার কষ্টবহন—এই সকল ধর্ম্মের প্রধান লক্ষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়া আসিতেছে। ঈশ্বরকে যে দেখা যায় ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানে বলেনা। তিনি অগম্য, অস্পৃশ্য তাঁহার নিকট মনুষ্য পৌঁছিতে পারেনা। সুতরাং পূজ্য পদার্থ যেখানে দূরে রহিলেন, সেখানে পূজাতে সুখ কি? ধর্ম্ম কঠোর হইয়া গেল, উপাসনা শুষ্ক হইল. জ্ঞান তর্কজাল বিস্তারকরিয়া প্রকৃত তত্ত্বকে ঢাকিয়া ফেলিল। বঙ্গদেশে শুষ্ক জ্ঞান আসিয়া ধর্ম্মকে শুষ্ক করিয়া দিল। এমন সময়ে মহাপ্রভু চৈতন্য যেন স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া তৃষিত হৃদয়কে শান্ত করিলেন। তিনি ক্রোধ ও ভয় বিদায় করিয়া দিলেন। ভগবান সম্ভোগের পদার্থ। তাঁহাকে ভাল বাসা যায়। তাঁহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া বিমোহিত হইতে হয়। তাঁহার দয়াতে হৃদয় বিগলিত হয়। যাঁহার এত দয়া, এত প্রেম, এত সৌন্দর্য্য তাঁহার নামে ভক্ত-

হৃদয় নৃত্য করে। তিনি হৃদয়স্বামী, প্রেমসরোবর; তাঁহাকে দেখিলে পাগল হইতে হয় এবং তাঁহার অদর্শনে প্রকৃত বিরহ উপস্থিত হয়। এই ভক্তিনদী চৈতন্য স্বর্গ হইতে নামাইয়া লইয়া আসিলেন। যেখানে মরুভূমি ছিল সেখানে ভক্তিগঙ্গা প্রবাহিত হইল। যেখানে জ্ঞান মনকে বিকল করিয়া দিয়াছিল, সেখানে ভক্তি সকল অঙ্গকে সতেজ করিয়া দিল। আর পাপী দিগের ভয় কি? কঠোর সাধন, শুষ্ক উপাসনা, ন্যায়-শাস্ত্রানুমোদিত বচন আর পরিত্রাণের উপায় বলিয়া গণ্য হইবে না। নামে মুক্তি ইহাই চৈতন্য দেবের একমাত্র বচন হইল। এই সমাচার তিনি স্বর্গ হইতে আনিলেন। তিনি বলিলেন, মুক্তির জন্য আর কিছুই প্রয়োজন নাই। কেবল হরিভক্তি, হরিভক্তি, হরিভক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। হরি-প্রেম, হরিনাম, হরিসাধন ইহাই পাপীর গতি ও মুক্তির কারণ। হরিকে ভাল বাসিতে হইবে, বিরহিণীর ন্যায়। তাঁহার দর্শন না পাইলে মন অস্থির হইবে। সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহাকে হৃদয়, প্রাণ, মন দিতে হইবে। চৈতন্য হরিনামে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিজে মাতিয়াছিলেন, এবং বঙ্গবাসীদিগকে মাতাইয়াছিলেন। কি মিষ্ট কথা তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল। আর জ্ঞানাভিমান নাই, আর জাতীয় অভিমান নাই, আর ধনের গৌরব নাই। যাহারা মূর্খ তাহারাও নামে তরিয়া যাইবে। যাহারা চণ্ডাল কিম্বা যবন তাহারাও সহজে স্বর্গে প্রবেশ করিবে। যাহারা ধনী তাহা-

দিগকে সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া কোপীনধারী হইয়া ভিক্ষুকবৃত্তি লইতে হইবে। সকলকে তৃণসমান হইয়া হরির সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে।

আমরা যে নিয়মের কথা অন্যান্য মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধে বলিয়াছি তাহা চৈতন্যদেবসম্বন্ধেও খাটে। বুদ্ধ বলিলেন বাসনাগ্নি নির্ব্বাণ কর। তাহাতে মনের একটি দিক খালি হইল। সক্রেটিস বলিলেন জ্ঞানাভিমান পরিত্যাগ কর। তাহাতে মনের আর একটি দিক খালি হইল। ঈশা বলিলেন স্বেচ্ছা ত্যাগ কর। তাহাতে মনের আর একটি দিক খালি হইল। ইহাতে কি ধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইল ? না। সকল খালি করিলেও আর একটি দিক খালি হইল না। মানুষ সব ছাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে সে সুখী নাও হইতে পারে। আমি ধর্ম্মের খাতিরে, কর্ত্তব্যের খাতিরে, সংসারের নির্য্যাতনে ধন ছাড়িতে পারি ; পরিবার বন্ধুকে ছাড়িতে পারি ; সর্ব্বস্ব ছাড়িতে পারি। এ সকলেতে মনে শান্তি হইল বটে কিন্তু সম্ভোগ কি হয় ? স্বর্গের দেবতারা কি সর্ব্বদা মৌনবদনে থাকেন ? তাঁহারা কি "গোমড়ামুখ" হইয়া দিন পাত করেন ? কখনই নহে। তাঁহারা সম্ভোগ করেন। এখন বল দেখি সম্ভোগ কিসে হয় ? কেবল ভালবাসাতে। স্বর্গে প্রেম বলিয়া একরূপ একটি পদার্থ আছে, যাহার সুধাপান করিয়া দেবতারা সর্ব্বদা উন্মত্ত থাকেন, যাহার সম্ভোগ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা নৃত্য করেন, যাহার উত্তেজনায় তাঁহারা সর্ব্বদা হরিনাম সংকীর্ত্তন

করেন। সেই প্রেম এখন আমার মনে আসা চাই। তাহা না আসিলে ধর্ম মধুর হইল না। যদি ধর্মে কবিতাকুসুম প্রস্ফুটিত করাইতে চাও তবে হরিপ্রেমে মত্ত হও। এই প্রেম মনে কিরূপে আসিবে? তোমার হৃদয়কে খালি কর। হৃদয়কে খালি করা ইহার অর্থ কি? তুমি পৃথিবীতে যাহাকে ভালবাসা দিয়াছ তাহা ফিরাইয়া লও। পুত্র পিতাকে ভাল বাসে; বন্ধু বন্ধুকে ভাল বাসে; পুরুষ স্ত্রীকে ভাল বাসে; স্ত্রী পুরুষকে ভাল বাসে: এই সব ভালবাসা টানিয়া লইয়া হৃদয় খালি কর এবং হৃদয় খালি হইলেই সেই সব ভাল বাসা হরিতে গিয়া পড়িবে। তাহা হইলে হরি তোমার নিকট তাঁহার সুন্দর মূর্ত্তি প্রকাশ করিবেন এবং তুমি সেই মুখ দেখিয়া সকলই ভুলিয়া যাইবে। আর তোমার নিকট কিছুই ভাল লাগিবে না। হরিমুখদর্শন, হরিনাম শ্রবণ, হরিগুণ-কীর্ত্তন তোমার একমাত্র সম্ভোগ হইবে। শয়নে, স্বপ্নে হরি তোমার ধ্যান, হরি তোমার মন্ত্র, হরি তোমার সাধন হইবেন। তুমি হরির, হরি তোমার, এই ভাবে প্রেমে প্রেমে বদ্ধ হইয়া লোকে প্রেমরাজ্যে প্রবেশ করিবে। এই ভালবাসাশাস্ত্র চৈতন্য দেব বঙ্গদেশে প্রচার করিলেন। ইহাতে বঙ্গের নবজীবন হইল, পৃথিবীর গতি হইল। পৃথিবীর লোকেরা ধর্ম্মকে কঠোর বলিয়া জানিত; চৈতন্যদেব ইহাকে সম্ভোগের পদার্থ করিয়া ইহাকে মধুর করিয়া দেখাইলেন। আমরা কি চৈতন্যের ঋণ কখন পরিশোধ করিতে পারিব? হরিনাম-

কণ্ঠমালা তিনি বঙ্গের হৃদয়ে পরাইয়া দিলেন। সেই অলঙ্কার ধারণ করাতে বঙ্গের কত সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে।

আমরা এতক্ষণ ভগবানের লীলা কীর্ত্তন করিলাম।

তীর্থ। বাস্তবিক মানব সমাজের ইতিহাস পাঠ করিলে হৃদয় চমকিত হয়। সেই লীলাময় হরি সমুদয় ইতিহাসের জীবনস্বরূপ। তাঁহাকে ছাড়িয়া দিলে সেই ইতিহাস অসংলগ্ন, বিচ্ছিন্ন, অভিপ্রায়শূন্য বলিয়া বোধ হয়। কেবল মানুষেরা ছায়াবাজির পুত্তলিকার ন্যায় রঙ্গভূমির উপর আসিতেছে ও যাইতেছে ইহাই মনে হয়। কিন্তু ভগবান ইহার ভিতরে আছেন ইহা বিশ্বাস কর তাহা হইলে জনসমাজ আর একভাবে দৃষ্টিগোচর হইবে। ইতিহাস তাঁহার এক প্রকাণ্ড অভিনয় বলিয়া বোধ হইবে। সকল ঘটনাগুলি এক প্রকাণ্ড অভিপ্রায়কে সিদ্ধ করিতেছে; এবং অতি সামান্য ব্যাপারগুলিরও এক প্রকাণ্ড অর্থ আছে তাহা বুঝিতে পারিবে। কেমন ক্রমে ক্রমে তিনি মনুষ্যদিগকে তাঁহার নিকটে লইয়া আসিয়াছেন। যেটি যখন হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল সেইটি তখনই হইয়াছে। দেখ চৈতন্যদেব বুদ্ধের অগ্রে আসেন নাই, কিম্বা সক্রেটিসের অথবা ঈশার পরেই জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৎসর গুলি মিলাইয়া লও, দেখিবে যে মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব ক্রমান্বয়ে একই ভাবে হইয়াছিল। এই অভিনয় পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহা ভাবিলেও পরিত্রাণ হয়।

কিন্তু কেহ কেহ বলিতে পারেন যে বাস্তবিক পরিত্রাণ কামনাকরিলে কি এত আলোচনা, এত শাস্ত্রপাঠ ও এত বিদ্যার আবশ্যক হয়? তাহা হইলে ত মূর্খদিগের আর কোন উপায় নাই; এবং নববিধান গ্রহণ কেবল পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ করিতে পারেন না। আমি এরূপ যুক্তি করিতেছি না। ধর্ম্মপিপাসা কি জ্ঞানদ্বারা চরিতার্থ হইতে পারে? ঈশ্বরলাভ কি শাস্ত্রপাঠ দ্বারা হইতে পারে? কখনই নহে। ভগবানের দয়া বুঝিতে হইলে জীবনের সামান্য ঘটনা গুলিই যথেষ্ট বলিয়া বোধ হয়। তাঁহাকে পাইতে হইলে তাঁহার কৃপাই কেবল একমাত্র উপায়। তাহা হইলে মহাপুরুষদিগের বিষয় এত বলিলাম কেন? ইহার কারণ আছে। নববিধান সমন্বয়ের ধর্ম্ম এটি বুঝাইতে গেলে কি কি ধর্ম্মের সমন্বয় করিতে হইবে তাহা অগ্রে বলা আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের মূলে কি কি সত্য আছে এটি বুঝিতে পারিলে সকলে তাহাদিগের সমন্বয় বুঝিতে পারিবে। প্রথমতঃ মানুষ বুদ্ধি চালনা করিয়া কখন সমন্বয় করিতে পারে না। যদি তাহা সম্ভব হইবে তাহা হইলে এত দিন পৃথিবীতে তাহা অনেক কাল পূর্ব্বে হইয়া যাইত। অনেক দিগ্‌গজ পণ্ডিত পৃথিবীতে জন্মিয়াছেন; তাঁহারা নিশ্চয় এ প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন। দ্বিতীয়তঃ সমন্বয় বুঝিতেও হয় না। সমন্বয় জীবনে, মানুষের চরিত্রে, কেবলমাত্র ঈশ্বরোপাসনাতে সম্ভব। নববিধানের ভক্ত নিজ জীবনে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের সমন্বয় দেখান। তিনি কি বিশেষ

চেষ্টা করিয়া তাহা দেখান ? না। তাঁহার মনে এমন একটি সুন্দর ভাব উদয় হয়, যে ভাব থাকিলে নিজ চরিত্রে কখন বুদ্ধ, কখন ঈশা, কখন চৈতন্য প্রকাশিত হন। যোগে প্রবৃত্ত হইবার সময় তিনি বুদ্ধের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন। সংসারের ঘোর পরীক্ষাবিভীষিকার ভিতর দিয়া উত্তীর্ণ হইবার সময় তিনি ঈশার ক্রুশকে একমাত্র নির্ভর স্থান করিয়া লন। ভক্তিরসে মত্ত হইতে হইতে তিনি চৈতন্যের ভাবে পরিপূর্ণ হন। তাঁহার আপনার মনে সকল মহাপুরুষদিগের জীবন আবির্ভূত হয়। বল করিয়া, চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে বলিতে হয় না—আমি বিপদে পড়িয়াছি, অতএব এখন ঈশাকে আলোচনা করা উচিত; মন সংসারের দিকে যাইতেছে, অতএব বুদ্ধদেবকে স্মরণ করি; হৃদয় শুষ্ক হই-তেছে, অতএব চৈতন্যদেব আমাতে অবতীর্ণ হউন। তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষদিগের ভাব আপনা-আপনি আসিবে। তাঁহার মনের এমন একটি ভাব হইয়াছে যাহাতে মহাপুরুষদিগের অবতীর্ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভা-বিক এবং স্বতঃসিদ্ধ। এইটিকে সমন্বয় বলে। ইহা একটি ভাবেই দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যের জীবনে ইহার প্রকাশ। কিন্তু ইহা হইলেও কেহ কেহ বলিতে পারেন যে নববিধান কখন একটি নূতন ধর্ম্ম নহে। ইহা কেবল অন্য অন্য ধর্ম্মের সমষ্টি। বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম, এইগুলি একত্র করিলেই নববিধান ধর্ম্ম

হইল। সমুদয় ধর্ম্মের ভাবগুলির সমষ্টি করিয়া বলিলেই হয় যে ইহা নববিধান ধর্ম্ম। ইহা কি ঠিক কথা? না। নববিধান বিশ্বাসের ধর্ম্ম। যিনি নববিধানী তিনি এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন। ইহাতে কেহ কেহ এই আপত্তি আনিতে পারেন যে মুসলমানও ত এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, খ্রীষ্টানও ত এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। আমি বলি যে তাহা নহে। যে ভাবে নববিধানী ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন সে ভাবে মুসলমান ও খ্রীষ্টান ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন না। খ্রীষ্টানেরা ইহা বিশ্বাস করেন না যে সকলদেশের মহাপুরুষেরা ঈশ্বরপ্রেরিত, যে সকল ধর্ম্মই একটি একটি বিধান, জনসমাজের বিশেষ বিশেষ অভাব দূর করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহারা কেবল নিজের ধর্ম্মকে ঈশ্বরের বিধান বলেন, কেবল খ্রীষ্টানেরাই স্বর্গের অধিকারী এইরূপ স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়াছেন। পৃথিবীর সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরা এইরূপ আপনাদের ধর্ম্মকে ঈশ্বরপ্রেরিত মনে করে এবং অন্যান্য ধর্ম্মকে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও শয়তানপ্রেরিত এই বিশ্বাস করে। অবতারের যে ভাবগুলি পৃথিবীকে দিয়া গিয়াছেন, সে সকল ঠিক যে ঈশ্বরের ভাব ইহা কেহই বিশ্বাস করে না। প্রত্যেকে ঈশ্বরকে একদিক হইতে (সেটি আপনার দিক) দেখে। সুতরাং আপনার দিকটি সত্য, এবং অন্য দিক গুলি মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। এরূপ ভ্রম অনেকটা স্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তথাপি ইহা যে ভ্রম তাহার

কোন সন্দেহ নাই। ভারতের মধ্য দেশ দিয়া অনেক স্রোত-স্বতী বহমানা হইতেছে; সেই সেই দেশের লোকেরা, সেই সেই নদীর হিমালয়ে উৎপত্তি ইহা স্বীকার করে, কিন্তু অন্যান্য নদীর বিষয় তাহারা জানে না। কিন্তু যে লোক হিমালয়ে থাকিয়া সকল নদীকে নিরীক্ষণ করে সে বুঝিতে পারে যে এক একটি প্রদেশকে উর্ব্বর করিবার জন্য, এক একটি প্রদেশের বিশেষ অভাব মোচন করিবার জন্য এক একটি নদীকে হিমালয় নিম্ন ভূমিতে প্রেরণ করেন। হিমালয় হইতে না দেখিলে উদার চক্ষুতে সকল নদীকে দেখা যায় না। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ঠিক সেই কথা। ভগবানের দিক হইতে দেখিলে পৃথিবীর ধর্ম্মসকল নদীদিগের ন্যায় বোধ হইবে। প্রত্যেকে একটি দেশের বা কালের বিশেষ অভাব মোচন করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। মনে এমন একটি স্থান আছে যে স্থান হইতে দেখিলে ভগবানের দিক দেখা যায়, ধর্ম্ম সমন্বয়ের দিক দেখা যায়।

সে দিকটি কি? এই প্রশ্নের সুচারু উত্তর দিতে পারিলে আমরা সমন্বয় শাস্ত্র বুঝিতে পারিব। সেই দিকটি নিরূপণ করা নববিধানের বিশেষ সাধন। আমরা প্রথমেই দেখিতে পাই যে ভগবানের দিকটি পাইতে হইলে মনকে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের করা চাই, এবং ভগবানের হইতে গেলে মনে কিছুমাত্র স্বার্থ, কুসংস্কার, বিদ্বেষ ও ক্রোধ রাখা উচিত নহে। আমরা বলিয়াছি যে নববিধান বিশ্বাসের ধর্ম্ম। ভগবানকে অনন্ত-

রূপে বিশ্বাস করিতে গেলে আপনার যাহা কিছু তাহা ছাড়িতে হয়, এবং সমস্ত অস্তিত্ব ভগবানকে ছাড়িয়া দিতে হয়। এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে আমরা সকল ঘটনাতে, সকল পদার্থে, কেবল ভগবানকেই দেখিতে পাইব। আর যত তাঁহাকে দেখিতে পাইব ততই আমাদিগের বিশ্বাস বলবান্, অলন্ত এবং জীয়ন্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইবে। যিনি ভক্ত তিনি জীবনটি কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে করিতে অতিবাহিত করেন। তিনি শয়নে, স্বপ্নে, জাগ্রত-অবস্থায়, বসিতে, চলিতে, আহার করিতে কেবল ভগবানের অস্তিত্বই প্রত্যক্ষ করেন। প্রতি ঘটনাতে তাঁহার হস্ত দেখিতে পান। সুতরাং সমুদয় ইতিহাসে ভগবানের কথা ভিন্ন আর কোন কথা শুনিতে পান না। ভগবান যেমন পিতা হইয়া প্রকৃতির নিয়ম চালনা করিয়া দিতেছেন, তেমনি পুত্র হইয়া মনুষ্যসমাজের শাসন ও পুনর্গঠন করিয়া দিতেছেন; এবং তেমনি পবিত্রাত্মা হইয়া ভক্তদিগের ধর্ম্মবেগ ও শক্তির আদি কারণ হইতেছেন। ভক্তের মনই তখন স্বর্গ। সেই স্বর্গে ভাগবত শাস্ত্র নিত্য রচিত ও পঠিত হয় এবং সেই শাস্ত্র লিপিবদ্ধ হইয়া পৃথিবীকে স্বর্গের দিকে লইয়া যায়।

মন সম্পূর্ণরূপে স্বার্থবিহীন হইলে, তাহাতে এক প্রকার ভাবের উদয় হয়, তাহাকে সহানুভূতি* বলে। এই সহানুভূতির নিয়ম ধর্ম্মজগতের এক অদ্ভুত নিয়ম। ইহা বুঝাইতে গেলে অনেক

---

* ইংরাজীতে তাহাকে Sympathy বলে।

কথার প্রয়োজন হয় না। সহানুভূতির অর্থ আপনাকে অন্যের অবস্থাতে ফেলা। এটি স্বার্থ থাকিলে হইতে পারে না। মনে কর একজন লোক মাতৃহীন হইয়া পথে বসিয়া কাঁদিতেছে। তোমার তাহাকে দেখিয়া দয়া হইল, কিন্তু আর একজন বোধ হয় দশবার সেই পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছে; তথাপি সে তাহার দুঃখ দেখিয়া একবারও তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিল না। তোমার দয়া হইল তাহার কারণ এই যে তুমি মনটিকে সেই অনাথের অবস্থাতে একেবারে ফেলিতে পারিলে। তুমি মনে করিলে যে তুমিই সেই অনাথ এবং তোমারই পিতা মাতার বিয়োগ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থাতে যাহা যাহা দুঃখ ও যন্ত্রণা হইতে পারে তাহা সমুদয়ই তুমি অনুভব করিতে পারিলে। তোমার দয়ার পূর্ণ বিকাশ হইল এবং তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য তোমার পূর্ণ চেষ্টা ও যত্ন হইল। কিন্তু আর একজন লোক নিজের স্বার্থ লইয়া ব্যতিব্যস্ত। সে আপনাকে সেই অনাথের অবস্থাতে ফেলিতে পারিল না এবং তাহার মনে দয়াও আসিল না। যাহারা নির্দ্দয় হয় তাহারা সহানুভূতি করিতে পারে না বলিয়া নির্দ্দয় হয়। বুদ্ধ কষ্ট কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। একদিন তিনি বাগানে বেড়াইতে ছিলেন এমন সময় তাঁহার একজন সঙ্গী একটি পক্ষীকে শর দিয়া আঘাত করিল। পাখি ভূতলে পড়িয়া ছটফট্ করিতে লাগিল। বুদ্ধ তাহাকে যত্নের সহিত তুলিয়া লইয়া অনেক রূপে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে পাখি সান্ত্বনা মানিল না। তিনি

মনে করিলেন—পাখী কেন এমন করিতেছে? এমন সময় তিনি সেই শরটি তাহার শরীর হইতে তুলিয়া লইলেন এবং তুলিয়া লইয়াই নিজ হস্তে তাহা বিদ্ধ করিলেন। বিদ্ধ করিবামাত্র তাঁহার দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন পাখী কেন এত ধড়ফড় করিতেছিল এবং তখনই জল দিয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। বুদ্ধ সহানুভূতির নিয়ম বুঝিতে পারিলেন এবং সেই দিন হইতে তিনি জীবে দয়ার শাস্ত্র পৃথিবীতে প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যান্য ধর্ম্মে তে মনুষ্যের প্রতিই কেবল দয়া করিবার বিধি দেয়; কিন্তু মনুষ্য এবং জীবে দয়া করিবার আদেশ বৌদ্ধধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম দেয় নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম সেই দয়া প্রচার করিয়াছে।

সহানুভূতি দয়া'শাস্ত্রের পত্তন স্বরূপ। এই সহানুভূতি থাকিলে রাজপুরুষেরা রাজ্যশাসনে কৃতকার্য্য হন; বৈজ্ঞানিকেরা লোকের অভাব মোচনের উৎকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন; সুদক্ষ চিকিৎসক নানা উপায়ে রোগীকে ভুলাইতে পারেন; গুরু শিষ্যদিগকে কৌশল করিয়া সুপথে আনয়ন করিতে পারেন; শিক্ষক ছাত্রদিগকে বিদ্যার দুর্গম পথ দিয়া লইয়া যাইতে পারেন। যে রাজার বা যে মন্ত্রীর সহানুভূতি নাই, সে রাজা বা সে মন্ত্রী কথায় কথায় দেশকে অন্য জাতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত করে; কিম্বা অধিক কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে উৎপীড়িত করে। যে বৈজ্ঞানি-

কের সহানুভূতি নাই সে কেবল লোক হত্যা করিবার যন্ত্র রচনা করে। কিন্তু যাঁহার দয়া প্রচুর তিনি কেবল লোক হিতার্থে জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন। যে চিকিৎসকের সহানুভূতি আছে সেই চিকিৎসকই জগতে ধন্বন্তরি বলিয়া বিখ্যাত হন। কত শিক্ষক সহানুভূতির অভাবে মন্দ শিক্ষক বলিয়া নিন্দনীয় হন। বিলাতের একজন প্রসিদ্ধ শিক্ষকের জীবনীতে লিখিত আছে যে, তিনি একজন ছাত্র পাঠ বলিতে পারে নাই বলিয়া তাহাকে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিয়াছিলেন। ছাত্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, "আপনি আমাকে শাস্তি দিতেছেন কেন? আমি আলস্য বশতঃ পড়া করি না তাহা নহে; আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও পারি না। তাহার জন্য আপনি আমাকে শাস্তি দিবেন কেন?" শিক্ষক তাহা শুনিয়া নিরস্ত হইলেন। তিনি সেই অবধি নিতান্ত লজ্জিত হইয়া আর অকারণে শাস্তি দিতেন না। তিনি বুঝিলেন যে যাহাদিগের মস্তিষ্ক স্বভাবতঃ দুর্ব্বল, তাহারা অনেক চেষ্টা করিয়াও পড়া করিতে পারে না। তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া আর প্রকৃতিকে শাস্তি দেওয়া একই কথা। সহানুভূতিই মনুষ্যস্বভাব বুঝিবার একমাত্র উপায়। যে লোক সহজে আপনাকে অন্যের অবস্থাতে ফেলিতে পারে, সে আপনার মনের উপর এমন একটি আধিপত্য স্থাপন করে যে সে তাহার দ্বারা অক্লেশে অন্য লোককে বুঝিতে পারে। পৃথিবীতে যাঁহারা বড় লোক হইয়াছেন—কবি বল, রাজপুরুষ বল, বা, সুবক্তা

বণ, তাঁহারা কেবল এই ক্ষমতাদ্বারাই জীবনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। মহাকবি সেক্স্পিয়ার মনুষ্যস্বভাব এতদূর আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে তিনি সকল প্রকার লোকের চরিত্র বাক্যদ্বারা অঙ্কিত করিতে পারিতেন এবং তাঁহার ছবিগুলি এত স্বাভাবিক ও সত্য বলিয়া বোধ হয় যে অনেকে মনে করেন যে সেক্স্পিয়ার নিজে সেই অঙ্কিত লোকগুলির মত ছিলেন। ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া মনে হয় যে সেক্স্পিয়ার নিজে ধার্ম্মিকের চূড়ামণি ছিলেন। ডাক্তার উকীল, মাতাল, হত্যাকারী, লম্পট—ইহাঁদিগের বর্ণনা পড়িলে বোধ হয় যে সেক্স্পিয়ার নিজেও এই প্রকার লোক ছিলেন। তাহা না হইলে ঠিক্ তাহাদিগের ছবি তিনি কেমন করিয়া লিখিতে পারিতেন! এটি কেবল সহানুভূতির একমাত্র ফল। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে লইয়া যেন ছেলেখেলা করিতেন। তিনি উচ্চপদস্থ সেনাপতি হইতে সামান্য পদাতিক পর্য্যন্ত সকলকে বুঝিতে পারিতেন। সকলকে আদর করিতেন, সকলকে শাসন করিতেন, অথচ তাঁহার আদরে, তাঁহার শাসনে কিছুমাত্র অনিষ্ট হইত না। তাঁহার একটি একটি কথা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় যোদ্ধার হৃদয়কে প্রজ্বলিত করিয়া দিত। তিনি যেমন রাজভবনে বাস করিতে পারিতেন, তেমনি আবার যুদ্ধক্ষেত্রে, রজনীতে, শীতকালে, বিচালির শয্যায় পড়িবামাত্রও ঘোর নিদ্রাগত হইতেন। তিনি আপনাকে সকলের অবস্থাতে ফেলিতে পারিতেন। যত দিন

ইহা পারিতেন, তত দিন তাঁহার অসাধারণ কৃতকার্য্যতা ছিল। কিন্তু যে দিন হইতে তিনি উচ্চ আশার দাস হইয়া কেবল স্বার্থ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, সেই দিন হইতে তাঁহার সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। সেই দিন হইতে তিনি আর লোককে বুঝিতে পারিতেন না। সেই দিন হইতে তাঁহার পতন হইল। এক জন সুবক্তা শ্রোতৃবর্গকে হাসাইতে, কাঁদাইতে, নাচাইতে পারেন। তিনি যখন যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন। যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা লইয়া যেরূপ গড়িতে চাহে তাহাই গড়িতে পারে, সুবক্তা সেইরূপ শ্রোতাদিগকে লইয়া যে ভাবে খেলা করিতে চাহেন সেই ভাবে খেলা করেন। তিনি যেন প্রত্যেক লোকের মনে প্রবেশ করিয়া তাহার ভাব গতিক বুঝিয়া লইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কথা সকল তাহার হৃদয়ে গিয়া লাগে। সে তাহা অতিক্রম করিতে পারে না। তিনি সহানুভূতি দ্বারা মনুষ্য-স্বভাব বুঝিয়াছেন।

যে লোকের সহানুভূতি নাই, সে কেবল স্বার্থ দ্বারা পরি-চালিত হয়। তাহার মনে কোন একটা রিপু বা কোন একটা ভাব সম্পূর্ণরূপে আধিপত্য করে; আর সেই রিপু বা সেই ভাবের ভিতর দিয়া সে জগতকে দেখে। যে ক্রোধপরবশ সে মনে করে যে সকল লোকই ক্রোধে অস্থির। যে ধনলোভী সে মনে করে যে সকল লোকই ধনের জন্য লালায়িত। যে স্বার্থপর, সে সকলকে স্বার্থপর দেখে। তাহার নিজের ভাবটি

তাহার চক্ষের চস্‌মা হইয়া উঠে। সে সেই চস্‌মা দিয়া জগৎকে দেখে। সুতরাং এরূপ লোক মনুষ্যস্বভাব বুঝিতে পারে না এবং এরূপ লোক মনুষ্যদিগের বিষয় যাহা বলে, তাহা কোন মতে বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না।

মনুষ্যপ্রকৃতি বুঝা মহৎপ্রকৃতির কার্য্য। যে লোক যে পরিমাণে আত্মাকে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছে, স্বার্থ ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, একটা মহৎ ভাবের আশ্রয় লইতে পারিয়াছে, সেই পরিমাণে সেই লোক মনুষ্যস্বভাব বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সংসারে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা বহুদর্শিতা বশতঃ অন্য লোককে বুঝিতে পারে। কিন্তু তাহারা কেবল বিষয়ীদিগকে বুঝিতে পারে। এক জন বিষয়ী ধার্ম্মিককে বুঝিতে পারে না, কিন্তু ধার্ম্মিক সকলকে বুঝিতে পারে। যাঁহারা যে পরিমাণে আপনাকে ভুলিয়া যাইতে পারেন তাঁহারা সেই পরিমাণে মনুষ্যপ্রকৃতি বুঝিতে পারেন। পৃথিবীর ধর্ম্মসংস্থাপকেরা মনুষ্যের অগ্রগণ্য। তাঁহারা পৃথিবীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়াছেন। তাঁহারা একমাত্র স্বর্গীয় ভাবের বশীভূত হইয়া জীবনান্ত করিয়াছেন। তাঁহারাই মনুষ্যস্বভাব সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন।

ইহাই ধর্ম্মজগতের নিয়ম। মহাপুরুষেরা আপনার আপনার মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়া অন্যদিগের মনের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেন। তাঁহারা এক আভাসে জগতের প্রকৃতি বুঝিয়া লইতেন। লোকসমাজের কি কি

কষ্ট, কি কি অভাব তাহা তাঁহারা এক মুহূর্ত্তে বুঝিয়া লই-তেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন বলিয়া সেই সেই কষ্ট এবং সেই সেই অভাবের ঔষধ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন। ঈশা যখন জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন জগৎ শুদ্ধ লোক তাঁহাদিগের নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত থাকিত। তাহারা আহার করিত, শয়ন করিত, সম্ভোগ করিত, যন্ত্রণা ভোগ করিত, অথচ তাহারা কেহই জানিত না যে তাহা-দিগের রোগ কি ছিল। কিন্তু দেখ, যে মুহূর্ত্তে ঈশা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরেতে আত্ম সমর্পণ করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি জগতের অভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং সেই অভাব মোচন করিবার জন্য কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহা একেবারে বুঝিতে পারিলেন। জগতের সকল লোক হাসিতেছিল, তিনি কেবল কাঁদিতেছিলেন। তিনি আপনাকে সকলকার অবস্থায় ফেলিয়া দেখিলেন যে তখনকার সকল লোকই জড় জগতে বদ্ধ এবং সকলকেই শরীরের প্রবৃত্তি-গণ দাস করিয়া রাখিয়াছে। তিনি বুঝিলেন যে শরীর আত্মাকে চাপিয়া রাখিয়াছে এবং শরীর মনুষ্যকে ঈশ্বরের নিকট যাইতে দিতেছে না। জগত শুদ্ধ লোক ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন আছে ইহা দেখিয়া তিনি অন্তরে অন্তরে কাঁদিতে লাগিলেন। ইহা কথিত আছে যে তিনি হাসিতেন না। এ রোগের ঔষধ কি? নিজের প্রাণ দেওয়া। প্রাণ দিয়া সেই প্রাণকে ঈশ্বরের পথে যাইবার সেতু করিতে হইবে।

ঈশা প্রাণ দিলেন এবং জগতেরও পরিত্রাণ হইল। তাঁহার কথা গুলি এমন জীবন্ত যে আমিও যখন রোগপাপসন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে ভাবি, তখন তাঁহার সেই কথা গুলি বোধ হয় যেন তিনি আমাকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন। ইহাঁকেই বলে মনুষ্যস্বভাব বুঝা। পৃথিবীর সকল মহাপুরুষেরাই এইরূপ মনুষ্যস্বভাব বুঝিতে পারিতেন। তাঁহাদিগের সহানুভূতি পূর্ণ পরিমাণে ছিল।

মহাপুরুষেরা যেমন আমাদিগকে বুঝিতে পারিতেন, তেমনি আমাদিগের উচিত যে আমরা মহাপুরুষদিগকে বুঝি। যে হেতু মহাপুরুষদিগকে না বুঝিলে আমরা ভগবানের লীলা সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিব না। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে মহাপুরুষদিগকে না বুঝিলে কি পরিত্রাণ নাই? ভগবানকে বুঝিলে কি হইবে না? ভগবানের হাতে যদি পরিত্রাণ থাকে তাহা হইলে মহাপুরুষদিগকে লইয়া আমার কি হইবে? মহাপুরুষদিগকে লইলে প্রকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মের যে একটি সহজ ভাব আছে তাহা কি নষ্ট করা হয় না? এ কথা গুলির উত্তর দেওয়া আবশ্যক। আমি যদি পৃথিবীর আর কিছু না লইয়া কেবল আপনাকে ভগবানের হাতেই সমর্পণ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় তাঁহার কৃপা পাইতে পারি। কিন্তু কথা হইতেছে যে ভক্ত কি কেবল আপনাকে লইয়া থাকিতে পারেন? তিনি ভগবানের হাতে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়াছেন। ভগবান তাঁহার সর্ব্বস্বধন, তাঁহার প্রাণপতি। তাঁহার সমগ্র প্রেম ভগবানকে

দিয়াছেন। তিনি শ্রীহরিকে কেবল যে নিজের ভিতর দেখিয়া তুষ্ট হন এমন নয়; তিনি সমুদয় ভূমণ্ডলকে হরিময় দেখেন। প্রেমিক ভক্ত, প্রেমের হরিকে সর্ব্বস্থানে দেখেন। তিনি যদি তাঁহাকে সকল স্থানে দেখিতে না পান, তাহা হইলে তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকেন ? কখনই নহে। নাস্তিকেরা বলিতেছে— দেখ তোমার হরি প্রকৃতিতে নাই। এই যে সকল প্রাকৃতিক ঘটনা দেখিতেছ ইহারা নিয়মবলে ঘটিতেছে; ভগবানের হাত কিছুতেই নাই। ভক্ত ব্যাকুল হৃদয়ে সূর্য্যকে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁ সূর্য্য, তোমাতে কি আমার হরি নাই ? মেঘকে জিজ্ঞাসা করেন; মেঘ, তোমার গর্জ্জন কি তাঁহারই গম্ভীর ধ্বনি নহে ? ফুলকে বলেন, তোমার সৌরভ কি তাঁহারই পুণ্যের সুগন্ধ নহে ? যাহা নাস্তিকে দেখিতে কিম্বা বুঝিতে পারিতেছিল না, তাহা তিনি একেবারে দেখিতে ও বুঝিতে পারিলেন। ভগবান পিতা হইয়া সকলেতে আছেন; সূর্য্যে, চন্দ্রে, মেঘে, পুষ্পে, নদীতে, সাগরে, সকল স্থানেই তাঁহার মুখ ভক্ত দেখিতে পাইতেছেন। বিজ্ঞান পিতার লীলা রহস্য বুঝাইয়া দিতেছে। ভক্ত তাহাতে মত্ত হইয়া আরও ভক্ত হইতেছেন। নাস্তিকেরা আবার বলিতেছে—তোমার ইতিহাস কেবল প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। জল, বায়ু ইত্যাদির গুণে কোন কোন দেশের লোকে কোন কোন বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত; আর সেই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান থাকাতেই বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিতেছে। ভারতের দর্শন শাস্ত্র, ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান এক প্রকার হইবে এবং ইউ-

রোগের আর এক প্রকার হইবে। এই যে বিভিন্নতা ইহা কটি কয়েক প্রাকৃতিক ঘটনা বশতঃ হইয়াছে। ভগবানের হাত ইহাতে কিছুই নাই। ভক্ত কিন্তু একবারে সায় দিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা জন সমাজের গতি ফিরাইয়া দিয়াছেন। একজন মহাপুরুষ যে শিক্ষা দিয়াছেন সে শিক্ষা জনসমাজকে সম্পূর্ণ নূতন রূপে গঠিত করিয়া দিয়াছে। তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশ নিরীক্ষণ কর, দেখিবে যে সেই শাক্য বুদ্ধ ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যাহা বলিয়া গিয়াছেন সেই শিক্ষা আজও, সেই সেই দেশের লোকদিগের কথায়, ভাবে, কার্য্যে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপের আচার, ব্যবহার রাজনীতি ও ধর্ম্ম, সকলই সেই ঈশার ভাবের পরিচয় দিতেছে। বুদ্ধকে না বুঝিয়া কেহ বৌদ্ধদেশের ইতিহাস বুঝিতে পারে না। ঈশাকে না বুঝিয়া কেহ ইউরোপের ইতিহাস বুঝিতে পারে না। সমুদয় জগতের ইতিহাস কেবল মহাপুরুষদ্বারাই রচিত। এক বুদ্ধ, এক ঈশা, এক মহম্মদ, এক চৈতন্য কত সহস্র সহস্র লোকদিগকে চালাইতেছেন। সেই জন্য বলিতেছি যে যেমন জগতের ইতিহাস ভগবানের লীলাতে পূর্ণ, তেমনি প্রত্যেক লোকের ইতিহাস ও তাঁহার লীলা, ও তাঁহার কৃপাতে পূর্ণ। মানুষ আপনাকে লইয়াই থাকিতে পারে। একজন ব্রাহ্ম কোন মহাপুরুষকে না লইয়া কেবল ভগবানকে উপাসনা করিয়াই থাকিতে পারে। কিন্তু সে মানুষ ভক্ত হইতে পারে

না। তাহার হৃদয় কঠিন। ভক্তিপ্রস্রবণ সে হৃদয়ে উঠে না। সে ক্রমাগত আপনাকে লইয়াই থাকে বলিয়া তাহার জ্ঞানও প্রস্ফুটিত হয় না। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত জগতকে ভগবানের লীলাভূমি বিবেচনা করেন; তাঁহার পক্ষে সমস্ত জগৎ এক প্রকাণ্ড বৃন্দাবন। নব নব লীলা, নব নব প্রেমের উচ্ছ্বাস তিনি সর্ব্বদাই দেখিতেছেন। কেবল নিজের দেশে নহে, সকল দেশে—কেবল নিজের মনে নহে, সকল মনে তাঁহার লীলা সম্পাদিত হইতেছে। ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস দিন দিন বাড়িতে থাকে; ভক্তিপ্রবাহ শত শত নদী দিয়া বহিতে থাকে। আর এক কথা এই যে ধর্ম্ম তাঁহার পক্ষে সম্ভোগের পদার্থ। পৃথিবীতে ধর্ম্ম যে ভাবে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে তাহাতে ইহা একটি কঠোর কর্ত্তব্যসাধনের ব্যাপার হইয়াছে। ধর্ম্মেতে রসকষ কিছুই নাই, উপাসনার সময় লোকে নিদ্রা যায়। ধর্ম্ম যদি সম্ভোগের পদার্থ হয় তাহা হইলে ইহার জন্য কি লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হইত? ভক্তেরাই ধর্ম্ম সম্ভোগ করেন, কেন না তাঁহারা প্রতিপলকে ভগবানকে নবভাবে দেখিতে পান, প্রতিঘটনাতে তাঁহার হস্ত দেখেন, প্রতিদেশে তাঁহার লীলা দেখেন, প্রতিযুগে তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেন। কঠোর ব্রাহ্ম শুষ্কতার্কিক ও অল্প বিশ্বাসী, কেন না সে লোক কেবল আপনার সঙ্কীর্ণ হৃদয়টাই দেখিয়া থাকে। আপনার হৃদয়ে কয়টা দৈবঘটনা দিবসের মধ্যে বা বৎসরের মধ্যে হইয়া থাকে? আর যে

লোক সমুদয় পৃথিবী তাঁহার লীলাক্ষেত্র বলিয়া দেখে তাহার প্রতিঘটনাতে বিশ্বাসচক্ষু আরও উন্মীলিত হয় এবং ভক্তি, ভগবানের কৃপা দেখিয়া দিন দিন প্রবলতরবেগে উথলিয়া উঠে। সেই জন্য বলিতেছি যে যদি ধর্ম্মকে মধুর করিতে চাও, যদি ভক্তিতে হৃদয়কে সদা আর্দ্র রাখিতে চাও, যদি ধর্ম্মকে সম্ভোগ করিতে চাও, তবে চক্ষুকে কোন একটি জীবনে, কি দেশে, কি কালে বদ্ধ রাখিও না। হৃদয়কবাট খুলিয়া দাও। জগত আসিয়া তাহাতে স্থান পাইবে। যত মহাপুরুষ ছিলেন কিম্বা হইবেন তাঁহারা সকলেই তোমাকে শিক্ষা দিবেন। যত ধর্ম্ম সকলেতেই তুমি ঈশ্বরবিধান দেখিবে। যদি সকল লোক সকল লোককে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতে পারেন, তাহা হইলে সকল লোক যে এক হইয়া গেল। আর যে পৃথিবীতে বিবাদ বিসম্বাদ থাকে না। জগত যে ধর্ম্মরাজের রাজ্য হইয়া যায়।

মহাপুরুষদিগকে না লইলে আমরা থাকিতে পারি না। মহাপুরুষদিগকে না লইলে প্রকৃত ধর্ম্মও হয় না। এত দিন পৃথিবীতে কেবল সঙ্কীর্ণ ঈশ্বরের পূজা হইয়া আসিতেছে। ভক্তির ঈশ্বর, যোগের ঈশ্বর, জ্ঞানের ঈশ্বর—ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন দেশে পূজিত হন। সেই জন্য কোন ধর্ম্ম কোন ধর্ম্মের সঙ্গে মিলে না; সেই জন্য এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য এক ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি খড়্গহস্ত। বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্তে কত শত্রুতা, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কত নির্যাতন! ভারতের ইতিহাসে

কৃষ্ণমহাদেবের যুদ্ধ পর্য্যন্ত দেখা যায়। সেই একই ঈশ্বর, কিন্তু এক খণ্ড ঈশ্বর অন্য খণ্ডের সহিত যুদ্ধে তৎপর। এই সমস্ত ধর্ম্মবিবাদের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড ভ্রম আছে দেখা যায়। মনুষ্যপ্রকৃতি কেবল ভক্তি নহে, কেবল যোগ নহে, কেবল জ্ঞান নহে, কেবল কার্য্য নহে। এই চারিটির সমষ্টি লইয়া মনুষ্যস্বভাব গঠিত। চারিটি ঈশ্বর এক করিলে এক ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। এ অঙ্কশাস্ত্র অতি বিচিত্র। ১ কে ১ দিয়া চারিবার যোগ করিলেও ৪ হয় না, ১ হয়। আমাদের শরীরে হস্ত একখণ্ড, মস্তক আর এক খণ্ড ইত্যাদি। এই সকল খণ্ডকে যোগ করিলে ১ হয় অর্থাৎ এক শরীর হয়। এরূপ অঙ্কশাস্ত্রানুযায়ী সকল ধর্ম্ম এক করিলে এক ধর্ম্ম হয়।

আমি বুঝিতে পারি না কিরূপে লোকে কেবল জ্ঞান, কেবল কার্য্য, কেবল ভক্তি কিম্বা কেবল যোগ লইয়া থাকিতে পারে। আমি যখন মনুষ্য তখন আমার এই সব গুলিই চাই। কেবল একটি লইয়া থাকিলে আমি সঙ্কীর্ণ হইব। একজন লোকের কেবল হস্ত আছে, ইহা যেমন মনে করা যায় না, তেমনি একজন লোকের কেবল জ্ঞান, কেবল কর্ম্ম, কেবল ভক্তি কিম্বা কেবল যোগ আছে ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। এত দিন কিন্তু পৃথিবীতে কেবল এই এক একটি ব্যাপারের সাধন হইয়াছে। তাহা আর চলে না। কেননা এক একটি সাধন হওয়াতে জগতে একতা হইতেছে না। দেখ ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য

শান্তি আনিয়া দেওয়া। কিন্তু কোন্ ধর্ম্ম যুদ্ধশাস্ত্র একেবারে উঠাইয়া দিতে পারিয়াছে। ঈশা নিজে শান্তি হাতে করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসমাজেই আজ যুদ্ধের মহা আড়ম্বর দেখা যায়। আজ ইউরোপকে এক প্রকাণ্ড যুদ্ধের শিবির বলিয়া বোধ হয়। ঈশা-ভক্ত ইউরোপীয় জাতিরা যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ঈশাকে, জয় লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়া থাকে। কি রহস্য, কি উপহাসের ব্যাপার! দেখা যাইতেছে যে সঙ্কীর্ণহৃদয় সঙ্কীর্ণ ঈশ্বরকে পূজা করিয়া দিন দিন আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। সেই জন্য এমন একটি ধর্ম্মের জগতে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন যে ধর্ম্মে এই সমুদয় খণ্ড খণ্ড ঈশ্বর এক হইয়া লোক সমাজকে এক করিয়া দিবে। নববিধান সেই ধর্ম্ম।

জগতের খণ্ড খণ্ড ঈশ্বরকে এক ঈশ্বর করিতে হইলে জগতের সকলধর্ম্মকে এক ঈশ্বর-প্রেরিত বলিয়া মানিতে হয়। প্রতিযুগে একটি একটি বিশেষ ভাব তিনি প্রেরণ করেন। সেই সকল যুগের সকল ভাবকে একত্র করিলে মনুষ্যস্বভাবের সকল ভাবের সমষ্টি হয়। যিনি ভক্ত তিনি একই চক্ষে একবার ভগবানকে যোগের, একবার ভক্তির, একবার জ্ঞানের, একবার কার্য্যের দেবতা বলিয়া দেখিতে পান। যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে এ ভাবগুলি আনিতে হয় না। ভগবান্ যে ভাবে প্রকাশিত হন ভক্ত স্বভাবতঃই তাহা দেখেন।

এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে মনুষ্যস্বভাবের পূর্ণতালাভ করিতে হইলে এই সকল ভাব প্রস্ফুটিত হওয়া চাই। একটি মাত্র ভাব থাকিলে মানুষ অসম্পূর্ণ থাকে। সর্ব্ব ভাবের সমষ্টি থাকিলে মানুষের মনুষ্যত্ব হয়। যদি কেহ বলেন যে ইতিহাসে এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় না, অর্থাৎ মানুষ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে না। জাতিবিশেষে বা লোকবিশেষে বা অবস্থাবিশেষে একটি একটি ভাবের প্রাদুর্ভাব থাকে। ইউরোপ কার্য্য লইয়া থাকিবে; সেখানে যোগের আধিপত্য থাকিবার সম্ভাবনা নাই। ভারত যোগ ও ভক্তি-প্রধান দেশ; সেখানে কার্য্যভাবের স্ফূর্ত্তি অধিকপরিমাণে হইতে পারে না। এ কথার উত্তর এই যে এতদিন পৃথিবীর লোকেরা যে এক একটি ভাব পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছে তাহার কারণ কেবল প্রকৃত শিক্ষার অভাব। সেরূপ শিক্ষা প্রণালী হয় নাই যাহাতে মনুষ্য স্বভাবের সম্পূর্ণতা হইতে পারে। যদি এরূপ শিক্ষা হইত তাহা হইলে বর্ত্তমান জাতীয় সঙ্কীর্ণতা থাকিত না। এখন এমন সময় আসিয়াছে যে এরূপ শিক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। আর সঙ্কীর্ণ হইলে চলিবে না। কারণ সঙ্কীর্ণতাহেতু জগতে এতদিন প্রকৃত শান্তি হয় নাই। জাতীয়শত্রুতা এইপৃথিবীকে রক্তে প্লাবিত করিয়াছে। ভাই ভাইকে আপনার বলিয়া স্বীকার করে না; এবং আমরা শ্রেষ্ঠ জাতি এই অভিমানে অন্ধ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ আছে।

একাধারে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন গুণের সামঞ্জস্য হইতে পারে। মনুষ্যের মনে বিভিন্ন ধর্ম্মের বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় হইতে পারে। ইহা কেবল শিক্ষার উপর, সাধনের উপর নির্ভর করে। আমরা বলি সেই শিক্ষা, সেই সাধনা দিবার জন্য নববিধান পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছে।

ধর্ম্মবিজ্ঞান কতকটা পরিমাণে এই শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইবে না। জর্ম্মনি দেশের পণ্ডিতেরা এই বিজ্ঞানের সূত্রপাত করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডে ম্যাক্সমূলর এই শাস্ত্র সাধারণের বুদ্ধিগোচর করিতেছেন। কিন্তু ইঁহারাও সমন্বয়ের দিকে আসিতে পারেন নাই। ইঁহাদিগের মতে অন্যান্য ধর্ম্মে সত্য আছে বটে, কিন্তু খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ এবং ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেই ধর্ম্মের সম্পূর্ণতা লাভ হয়। তাঁহাদিগের মতে এই ধর্ম্মে কোন অভাবই নাই, সুতরাং ইহা অনন্ত কালের ধর্ম্ম এবং ইহার পর অন্য কোন বিধান সম্ভবপর নহে। একথা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। আমরা দেখিয়াছি মনুষ্যসমাজের শৈশবাবস্থা হইতে ভগবান নরনারীর বিশেষ বিশেষ অভাব মোচন করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ বিধান পাঠাইয়াছেন। আমরা দেখিয়াছি কেমন ক্রমে ক্রমে, মনুষ্যের ধর্ম্ম উচ্চ হইতে উচ্চতর স্তরে উঠিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে যে আমরা কি ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্তরে আনিতে পারিয়াছি? যে সময়ে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রথম প্রচারিত হয়, তখন জগতের যে অবস্থা ছিল

এখন কি ঠিক সেই অবস্থাই আছে ? তখন যে সকল পাপ ও অভাব পৃথিবীকে নিপীড়িত করিত এখনও কি ঠিক সেই সকল পাপ ও অভাব আছে ? তাহা যদি না হয়, যদি একথা সত্য হয় যে এখনকার অভাব আর এক প্রকারের, তাহা হইলেই ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে এই সকল অভাব দূরীকরণের জন্য আবার আর একটি বিধানের আবশ্যক হইয়াছে এবং সেই বিধান আমাদিগকে আর একটি উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়া দিবে। যতদিন মনুষ্যস্বভাব পৃথিবীতে বর্ত্তমান, থাকিবে যতদিন অনন্ত বিধাতা তাঁহার অনন্ত আদর্শ লইয়া আমাদিগকে অনন্তের দিকে টানিবেন, ততদিন আমাদিগের অভাবের শেষ হইবে না এবং নববিধানেরও শেষ হইবে না। সেই জন্য কখনই বলিতে পারিব না যে এই ধর্ম্ম শেষ ধর্ম্ম ; ইহার উপর আর ধর্ম্ম নাই এবং ইহার পরেও কোন উচ্চতর ধর্ম্ম আসিবে না। অনন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিধান আসিবেই আসিবে। সেই সকল বিধান লোককে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ দিবে এবং সেই সকল বিধান দিয়াই আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিব।

ইউরোপে যে ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রচারিত হইয়াছে তাহাতে সুসভ্য জাতিদিগকে উদারতার দিকে অগ্রসর করাইয়া দিয়াছে। কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মসমন্বয় হইবে না। ধর্ম্মসমন্বয় জীবন দ্বারা হইবে, জ্ঞান দ্বারা হইবে না। একটি একটি ধর্ম্মের একটি একটি ভাব। সে ভাবটি আমরা বুদ্ধি

দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারিব না।" জীবনে তাহাকে উপলব্ধি করিতে না পারিলে সেটি যে ভগবান-প্রেরিত ভাব ইহা আমরা বুঝিতে পারিব না। ভাব মনের ব্যাপার—ইহা জীবনে দেখিতে হইবে, ইহার সত্যাসত্য জীবনে প্রমাণিত হইবে। ঈশা যে বলিয়াছিলেন, "আমি এবং আমার পিতা এক," খৃষ্টানেরা ইহার অর্থ করেন যে ঈশা তবে ঈশ্বর। কিন্তু এই ভাবটি যিনি জীবনে উপলব্ধি করিয়াছেন তিনি বলেন যে ঈশা সম্পূর্ণ স্বার্থশূন্য ছিলেন। তাঁহার নিজের কিছুই বলিবার ছিল না। আমার বাড়ী, আমার টাকা, আমার পরিবার, এরূপ কিছুই তাঁহার বলিবার ছিল না। তাঁহার হৃদয় শূন্য ছিল এবং সেই শূন্যতাবশতঃ দেবভাব তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং তিনি ঈশ্বরপূর্ণ ছিলেন। ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন তাঁহার ইচ্ছা কিছুই ছিল না। সুতরাং এ অবস্থাতে তিনি উত্তমরূপে বলিতে পারিতেন যে "আমি এবং আমার পিতা এক।" ঈশ্বরপুত্রই পিতার সম্বন্ধে এ কথা বলিতে পারিলেন; এবং যে ভক্ত জীবনে ত্যাগ-স্বীকারব্রত সাধন করিয়াছেন, যিনি স্বার্থত্যাগ করিয়া হৃদয়কে শূন্য করিতে পারিয়াছেন, পিতাপুত্রের একত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা জ্ঞানের কথা নহে, ইহা জীবনের কথা। জীবনে যেটি হইল সেইটি তিনি কথায় সন্নিবিষ্ট করিলেন। যাহারা জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারে নাই তাহাদিগের নিকট এই কথা একটি মত বলিয়া

প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু যিনি জীবনে ইহা দেখিয়াছেন তাঁহার নিকট ইহা একটি জীয়ন্ত, জলন্ত সত্য।

ফল কথা হইতেছে এই যে, যিনি হৃদয় শূন্য করিয়া ভগবানের উপর সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছেন তিনিই ঈশ্বরপ্রেরিত সমস্তধর্ম্মের ভাবগুলি জীবনে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান। তাঁহার নিকট এই সকল ভাব ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু সেইগুলি মনুষ্য-স্বভাবের ভাব, অনুরাগাবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সেই ভাবগুলি হৃদয়ে প্রত্যক্ষীভূত হইবেই হইবে। একজন ভক্ত এক সময়ে ঈশার ভাব, অন্য সময়ে শাক্যের ভাব, আর এক সময়ে বা চৈতন্যের ভাব জীবনে উপলব্ধি করেন। তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া ইহা করিতে হয় না। স্বভাবতঃ ভেল্‌কির মত তিনি, ভগবানকে যখন যে ভাবে সাজাইতে ইচ্ছা করেন সেই ভাবে সাজাইতে পারেন।

অনেকে মনে করেন যে ধর্ম্মসমন্বয় এ কথার অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মকে মিলিত করিয়া এক করা। যে ধর্ম্মেতে যাহা যাহা সত্য আছে, সেইগুলি একত্র করিয়া একটি মালা কিম্বা তোড়ারূপে পরিণত করা। নববিধান ধর্ম্ম ইহা নহে। আমাদিগের বুদ্ধি যাহা যাহা সত্য বলিয়া দেয় সেগুলিকে একত্রিত করিয়া একটি নব ধর্ম্ম প্রস্তুত করা এ ধর্ম্মের উদ্দেশ্য নহে। নববিধানশাস্ত্র একখানি শ্লোকসংগ্রহ নহে। ইহা জীবনের ধর্ম্ম; ইহাতে এমন একটি ভাব

আছে যে ভাবের প্রভাবে অন্যান্য ধর্ম্মকে এক ঈশ্বরের দিক হইতে দেখা যায়। এ বিষয়ে জগতের লোকেরা বলে মিশ্রণ ও সমন্বয়ের একই অর্থ। কিন্তু সেটি ঠিক নহে। দুটি পদার্থকে মিশ্রিত করিলে সংশ্লিষ্ট পদার্থে সেই দুটি পদার্থের সমুদয় গুণ থাকে। যেমন জলে চিনি মিশ্রিত করিলে সর্ব্বৎ হয় এবং সর্ব্বতে জল ও চিনি উভয়ই আছে; ইহাকে মিশ্রণ বলে। কিন্তু সমন্বয়ের অর্থ ভিন্ন প্রকার। দুইটি পদার্থ এমন ভাবে মিলিত হইবে যে সংশ্লিষ্ট পদার্থ একটি তৃতীয় পদার্থ হইয়া যাইবে এবং পূর্ব্বকার দুটি পদার্থের গুণ তাহাতে কিছুই থাকিবে না। যেমন অম্লজান এবং জলজান দুই প্রকার বাষ্প একত্রিত করিয়া যদি তাহাদিগের ভিতর দিয়া একটি তড়িতের শিখা চালাইয়া দাও তাহা হইলে তাহা জল হইবে। জল একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। ইহা অম্লজান ও জলজানে মিশ্রিত, অথচ ইহাদিগের একটির ও গুণ জলে নাই। অম্লজান অগ্নির দীপ্তি সম্পাদন করে এবং জলজান উত্তাপ সঞ্চালন করে। কিন্তু জল শীতল; ইহা পান করিলে উদর পরিপূর্ণ হয় এবং অগ্নিতে ঢালিলে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়। সেইরূপ জানিবে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের ভাবগুলি একত্র করিলে যদি তাহাদিগের ভিতর দিয়া দেবকৃপা রূপ তড়িত চালিত করিয়া দাও তাহা হইলে তাহা এরূপ স্বতন্ত্র একটি ধর্ম্ম হইবে যাহা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম নহে, মুসলমান ধর্ম্ম নহে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম নহে, হিন্দুধর্ম্মও নহে, অথচ এ সকল ধর্ম্মই

তাহাতে আছে। এই যে নূতন ধর্ম্ম, ইহার গুণ অন্যান্য ধর্ম্মের গুণের সঙ্গে মিলে না। যে রূপক দিয়া কথাটা বুঝাইলাম তাহা সহজভাবে উপলব্ধি করাইতে গেলে এই বলিতে হয় যে, যে হৃদয় শূন্য হইয়া ঈশ্বর দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে, সেই হৃদয়েই ভগবানের প্রত্যাদেশ হয় এবং তাঁহার কৃপাগুণে সেই হৃদয়ই সকলধর্ম্মের ভাবগুলিকে উপলব্ধি করিতে পারে। কিরূপে উপলব্ধি করিতে পারে? সব ভাবগুলি ভগবান দ্বারা প্রেরিত বলিয়া সেই এক ঈশ্বর ভিন্নরূপে জগতে আবির্ভূত হন। যোগের ঈশ্বর, ভক্তির ঈশ্বর, কার্য্যের ঈশ্বর, জ্ঞানের ঈশ্বর—আবির্ভাব ভিন্ন, কিন্তু ঈশ্বর এক। জগতের অভাব বিবেচনা করিয়া এক এক রূপের প্রকাশ হয়। সব রূপগুলি এক করিলে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তির সম্পূর্ণতা হইল। ভক্ত ঈশ্বরকে এই সকল ভাবের সমষ্টিরূপে দেখিতে পারেন, আর এক এক আবির্ভাবেও দেখিতে পারেন। ভগবানের লীলা ভক্ত হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন তিনি লীলাময়, ভক্তও তদ্রূপ লীলাময়। ভগবানের হৃদয়ে যেমন ভাবের খেলা, ভক্ত হৃদয়েও তেমনি। ভিন্ন ভাবের একতা যেমন ভগবানে, তেমনি সকল ধর্ম্মের সমন্বয় ভক্ত-জীবনে। ভক্তের জীবন ঈশ্বরে পূর্ণ। ভক্ত এবং ঈশ্বর এক, অর্থাৎ ভক্তের নিজের ইচ্ছা নাই। যাহা ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের ভাব, তাহাই ভক্তের। সেই জন্য ভগবানের সমুদয় লীলা ভক্ত জীবনে বর্ত্তমান। ভক্তের জীবন কখন

ভক্তিতে বিকসিত, কখন জ্ঞানে প্রাদুর্ভূত, কখন বা শক্তিতে উত্তেজিত, কখন বা পুণ্যে প্রদীপ্ত। ঠিক সেই সেই সময়ে তিনি চৈতন্যের ভাব, বা বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদিগের ভাব, বা ঈশার ভাব, বা বুদ্ধের ভাব জীবনে প্রদর্শন করেন। আবির্ভাব ভিন্ন বটে কিন্তু মূল বস্তু এক সেই ভগবান্। এক আধার হইতে নগরে জল আসিতেছে, কিন্তু কোথাও বৃষ্টি বর্ষণ রূপে, কোথাও ক্ষুদ্র নলের ভিতর দিয়া, কোথাও বা পুষ্করিণীর আকারে সেই জল দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে ভিন্নতার ভিতর একতা, এবং একতাতে ভিন্নতা দেখা যায়। জীবনে ভগবানের ভাব আসিলে জীবনের একতা হয়, কিন্তু আবার জীবনের কার্য্য গুলির ভিতর কত ভিন্নতা দেখা যায়। একই লোক ঈশার ন্যায় যেমন আত্মবলি দিতেছেন, চৈতন্যের ন্যায় তেমনি ভক্তিভাবে উচ্ছ্বসিত হইতেছেন, বুদ্ধের ন্যায় নির্ব্বাণের পরিচয় দিতেছেন, আবার ঘোর বৈজ্ঞানিক হইয়া অহোরাত্র শক্তির বিভিন্ন আবির্ভাবের পরীক্ষা করিতেছেন, আবার জ্যোতিষের ভিতর ভগবানের অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করিতেছেন, তিনি কখন বা যোগ করিতেছেন, কখন বা সদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া দৈব শক্তির পরিচয় দিতেছেন। তাঁহাকে কেহ খ্রীষ্টান বলিবে, কেহ বা বৌদ্ধ বলিবে, কেহ বা কার্য্যশীল শক্তিসম্পন্ন লোক বলিবে। জীবনের প্রকাশে ভিন্নতা দেখাইতেছেন, কিন্তু কার্য্যগুলি একটি লোক করিতেছেন, এক ভাব হইতে হইতেছে; এক অভিপ্রায়

সকলেতেই দৃষ্ট হইতেছে। ভিন্নতার ভিতর একতা দেখাইতেছেন।

ইহাকেই আমরা ধর্ম্ম সমন্বয় বলি। ভিন্নতার ভিতর একতা, ইহা জীবনে প্রকাশিত হয়। যে জীবনে এই একতা প্রকাশিত হইয়াছে সেই জীবনেই সকল ধর্ম্মের সমন্বয় হইয়াছে। ভিন্নতার ভিতর যে একতা আছে তাহা অভিপ্রায়ে বা উদ্দেশ্যে দেখা যায়। এই অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্যকে যদি আমরা বুঝিতে না চেষ্টা করি তাহা হইলে ঘটনাগুলির অর্থও বুঝিতে পারিব না। এক জন লোকই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে। আমরা কার্য্য গুলি দেখিয়া মনে করিব এই সকল কার্য্য গুলি ভিন্ন ভিন্ন লোকে করিয়াছে, কিম্বা যদি এক জন লোকে করিয়া থাকেন তাহা হইলে সে লোক কপট বা পরিবর্ত্তনশীল, স্থিরমতি লোক নহে। জগত সম্বন্ধে, ঈশ্বর সম্বন্ধে লোকে একথা বুঝিতে পারে না বলিয়া পৌত্তলিকতার সৃষ্টি হইয়াছে। যখন এ দেশীয় আর্য্যগণ হিমালয় প্রদেশে আসিয়া অধিনিবেশ করিল তখন তাহারা প্রকৃতির শোভা, প্রকৃতির শক্তি দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। সেই অগ্নি সূর্য্যাকারে পর্ব্বতের একদিক হইতে উদিত হইয়া নীহার রাশি সহস্র রশ্মিতে রঞ্জিত করিয়া কত শোভা ধারণ করিত, সেই প্রবলবেগে প্রবহমান সিন্ধুনদ কত পর্ব্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া গম্ভীরনাদে ধরা মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিত। বায়ু প্রবল বেগে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষকে সমূলে

উৎপাটিত করিত। বজ্র রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া সেই সকল চূর্ণ করিত। যেখানে তাহাদিগের দৃষ্টি পড়িত, সেখানেই নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন মূর্ত্তি, নূতন নূতন শক্তি তাহারা প্রত্যক্ষ করিত। এ সকলের রূপ ভিন্ন এবং প্রকৃতিও ভিন্ন। সুতরাং তাহারা স্বভাবতঃ এই মনে করিল যে ইহাদিগের প্রত্যেকের ভিতর একটি করিয়া অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। একই দেব ইহাদিগের ঈশ্বর ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না; কেননা একই হইতে এত ভিন্নতা আসে ইহা তাহারা কিছুমাত্র উপলব্ধি করিতে পারিত না। এইরূপ সংস্কার পৌত্তলিকতার আদি কারণ। কিন্তু দেখ বিজ্ঞানের বলে এখন এই একতার কেমন সহজ অর্থ হইয়াছে। যত প্রকার শক্তি আছে সকলই সকলের আকারে পরিণত হয়। উত্তাপ, তড়িত, দ্রব্যসংযোগ প্রভৃতি যে সকল শক্তি প্রকৃতিতে নিহিত আছে তাহারা মূলে এক শক্তি এই কথাই বিজ্ঞান প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং আমরা ইহাও বুঝিতে পারিতেছি যে সকল শক্তির মূলে এক আদি শক্তি ভগবান আছেন। তিনি ইচ্ছামতে, নিজ অভিপ্রায় সাধনের জন্য, সেই সকল শক্তিকে চালনা করেন। তিনি প্রভু, ইহারা তাঁহার যন্ত্র। নানা যন্ত্রের আশ্রয় লইয়া তিনি জগতের সৃষ্টি ও স্থিতিলীলা সম্পাদন করিতেছেন। মেঘে জলবিন্দু আছে এবং সেই সকল জলবিন্দু একত্রিত হইয়া বৃষ্টি হয়, এবং সেই বৃষ্টি শীতল। কিন্তু সেই শীতল জল রাশির ভিতরে উত্তাপময়, অগ্নিময় বিদ্যুতের সৃষ্টি।

ইহা দেখিয়া সহজে লোকের প্রতীতি হয় যে জলের একজন দেবতা এবং অগ্নির অন্য একজন দেবতা উভয়ে আকাশে থাকিয়া নিজ নিজ কার্য্য সাধন করিতেছেন। কিন্তু একই দেব ভিন্ন ভিন্ন শক্তির সামঞ্জস্য করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করাইতেছেন ইহা আমরা বুঝিতে পারি। বিজ্ঞানে ইহার অর্থ সহজ করিয়া দিয়াছে। ঘটনাগুলি ভিন্ন, আকার ভিন্ন; জলও অগ্নি ইহারা স্বতন্ত্র ও বিপরীত পদার্থ; কিন্তু যখন উদ্দেশ্যটী বুঝিতে পারি, যখন বুঝি যে একজন হইতে উদ্দেশ্যটী সংসাধিত হইতেছে তখন ভিন্নতার ভিতর একতার পরিচয় পাই। তখন সমুদয় জগৎ এক ঈশ্বরের সৃষ্টি ইহাও সহজে উপলব্ধি হয়। সেই এক ঈশ্বর হইতেই জন্ম মৃত্যু, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, শৈত্য উত্তাপ, নীল আকাশ ও প্রবল বাত্যা, শান্তি ও বিগ্রহ সকলই সম্পাদিত হইতেছে। এক ঈশ্বরের কার্য্যেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ধর্ম্ম জগতে ঠিক এই কথা; আপাততঃ একজন খ্রীষ্টান ও মুসলমান, শৈব ও বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও হিন্দুকে দেখিলেই বোধ হইবে যে ইহারা পরস্পরের উচ্ছেদসাধনের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এবং ইহাদিগের দেবতারা নিশ্চয়ই বিভিন্ন ও বিপরীত। কিন্তু যখন বুঝিবে এক ঈশ্বরই জগতের মঙ্গলসাধনের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, বিশেষ বিশেষ অভাব দূরীকরণ করিবার মানসে মহাপুরুষদিগকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন, যখন দেখিবে তারিখগুলি মিলাইলে ইহাঁদিগের আবির্ভাব যথা সময়েই হইয়াছিল, যখন

বুঝিবে ইহাঁদিগের প্রচারিত ভাবগুলির সমষ্টিতে মনুষ্য-স্বভাবের ভাব সকল প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন যে এই সকল ধর্ম্ম এক ঈশ্বরপ্রেরিত, ইহা বুঝিতে আর কোন গোল ঠেকিবে না। এত ভিন্নতার ভিতর অদ্ভুত একতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিশ্বাসীদিগের পক্ষে এই একতা সাধন করাই জীবনের একমাত্র কার্য্য। একতা সাধন—ইহার অর্থ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হওয়া। ধর্ম্মজীবন কেবল একমাত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস লইয়া। আমাদিগের বিশ্বাস সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া আমরা ধর্ম্মের উপকারিতা বুঝিতে পারি না। ইহা জীবন্ত ও জ্বলন্ত হইলে পৃথিবী আমাদিগের চক্ষে আর এক আকারে প্রকাশিত হয়। এই একতাসাধনশিক্ষার বিশেষপ্রয়োজন আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। ভক্তদিগের জীবনে কেবলমাত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভূত হয়। চারি দিকেই তিনি। উর্দ্ধে অধোভাগে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে তিনি আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া আছেন। নিশ্বাসপ্রশ্বাসে তিনি, ভক্তের প্রতি রক্তবিন্দুর প্রবাহে তিনি। ইহা যে কেবল বিশ্বাস করিব, তাহা নহে, ইহা স্বচক্ষে দেখিব। বিশ্বাস, দর্শন ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব কিরূপে চক্ষু ফুটাইতে পারি, কিরূপে বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত করিতে পারি ইহাই আমাদিগের চেষ্টা হওয়া উচিত।

পৃথিবীতে যত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, মানব

জাতির দুঃখভার মোচনার্থে যে যে মহাপুরুষ জীবন বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, সকলকার জীবনের ব্যাপারগুলি আমাদিগের সুচারুরূপে বোধগম্য করা উচিত। এই জন্য নববিধানে তীর্থযাত্রাপদ্ধতির এত আদর। তীর্থ যাত্রা অর্থে কোন স্থানে যাওয়া নহে। মহাপুরুষ দিগের জীবনে প্রবেশ করা, তাঁহাদিগের জীবনের তাৎপর্য্য অনুভব করা, এবং সেই তাৎপর্য্য দিয়া তাঁহাদিগের কার্যগুলি বুঝিতে চেষ্টা করা ইহারই নাম তীর্থ যাত্রা। যদি তাঁহাদিগের জীবনের একতা আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, তাহা হইলে বিধাতার লীলাও উপলব্ধি করিতে পারিব; ভক্তের জীবন দিয়া আমরা ভক্তের ভগবানকে বুঝিতে পারিব। সেই জন্য আমরা যত ভক্ত জীবন পাঠ করি ততই আমাদিগের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস গাঢ় ও ঘনীভূত হয়, ততই আমাদিগের ধর্ম্ম জীবন্ত ও প্রবল হয়।

এই তীর্থ যাত্রা সাধন আমরা কিরূপে করিব ? পূর্ব্বে যে সহানুভূতির কথা বলিয়াছি তাহাই ইহার একমাত্র উপায়। সহানুভূতির অর্থ আপনাকে অন্যের অবস্থাতে ফেলিয়া অন্যের ভাব বুঝিতে পারা। এই সহানুভূতি স্বার্থত্যাগ না করিলে সম্পূর্ণরূপে হইতে পারে না। যে পরিমাণে আপনাকে ত্যাগ করিতে শিখিব, সেই পরিমাণে অন্যের ভিতর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইব। বিশেষতঃ মহাপুরুষদিগের জীবন অনুভব করিতে হইলে সম্পূর্ণরূপে আত্ম-

বিসর্জ্জনের আবশ্যক। এইরূপে আপনাকে শূন্য করিয়া আমি মহাপুরুষতীর্থে যাত্রা করিব।

আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে কথিত আছে যে গুরুর সাহায্য বিনা কোন শাস্ত্রশিক্ষা হয় না। কোন গুরুর আশ্রয় লইতে হইলে সম্পূর্ণরূপে তাঁহার অনুগত হইতে হইবে এবং আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া গুরু যে পথ দিয়া লইয়া যাইবেন সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে। কোন বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে গেলে মনু হইতে সকল প্রকার পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান, কুসংস্কার, দ্বেষ বা ক্রোধ ছাড়িতে হইবে। কারণ মনে কোন প্রকার সংস্কার থাকিলে আমরা তাহা দ্বারা চালিত হইয়া স্বকপোলকল্পিত ভাবগুলি অবলম্বন করিব। তাহা আমাদিগের ভাব হইল, কিন্তু তাহা শিক্ষা হইল না। আমার চক্ষুতে যদি নেবা রোগ থাকে তাহা হইলে আমি সকল বস্তুকেই হরিদ্বর্ণ দেখিব; তেমনি আমার মনে যদি কুসংস্কার থাকে তাহা হইলে আমি সকল বস্তুকেই কুসংস্কাররঞ্জিত দেখিব। কথিত আছে যে একজন ধর্ম্মযাজক এবং একটি যুবতী চন্দ্রমণ্ডলে কি অঙ্কিত আছে সেই বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিল। ধর্ম্মযাজক বলিলেন, ওটা বোধ হয় একটি গিরিজার চূড়া; যুবতী বলিলেন না, একজন প্রণয়ী এবং একজন প্রণয়িনী পরস্পর পরস্পরকে সম্ভাষণ করিতেছে। এখানে যাহার মনে যে সংস্কারটী বলবান সে তাহারই বশবর্ত্তী হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে কি আছে তাহা কল্পনা করিয়া লইল। শিক্ষার প্রথম

নিয়ম সেইজন্য এই যে মনে যাহা কিছু বোধ বা সংস্কার ভাব বা টান আছে তাহা সমস্ত ভুলিয়া যাইতে হইবে। মন শূন্য করিয়া শিক্ষকের চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। মহাপুরুষদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতে হইলে এই নিয়মটি সর্ব্বাগ্রে পালন করিতে হইবে। তাহার পর ভগবানের নিকট সর্ব্বদা আলোকের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। আমরা যত মহাপণ্ডিতের নিকট যাই না কেন, ভগবান কৃপা না করিলে আমরা কিছুতেই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব না। তীর্থ আরম্ভ সেইজন্য উপাসনা দিয়াই হয়। এইরূপে মন প্রস্তুত হইলে আমরা মহাপুরুষের জীবনালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তিনি কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ সময় জীবিত ছিলেন, তখন সেই দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, তথায় অভাব কি কি ছিল, তখনকার লোকদিগের কিরূপ প্রকৃতি ছিল, এই সকল বিষয়ের একটি পরিষ্কার ছবি কল্পনার সাহায্যে অঙ্কিত করিয়া লইব। সেই দেশে, সেই সময়ে, সেই সকল অবস্থায়, সেই সকল লোকদিগের মধ্যে মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া কি কি করিলেন এবং কি কি বলিলেন ইহা ভাবিব। এইরূপ ভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিব যে, যে সকল বচন বা কার্য্যের কোন অর্থ করিতে পারিতেছিলাম না তাহা সুন্দররূপে পরিষ্কার হইয়া গেল, যাহা অতিশয় দুরূহ এবং দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হইতেছিল তাহা এখন সহজ এবং সুসাধ্য বলিয়া প্রতীত

হইল। সহানুভূতি কি প্রণালীতে কার্য্য করে তাহা গুটি কয়েক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

আথেন্স নগরে অনেক জ্ঞানী বাস করিতেন। তাঁহারা অর্থ লইয়া জ্ঞান বিতরণ করিতেন। পথে, হাটে, গৃহে, বনে ইহাঁদিগের সর্ব্বস্থানে গতিবিধি ছিল। জনতাপূর্ণ হাটের মধ্যে হয়ত এক জন জ্ঞানী বসিয়া কিম্বা দাঁড়াইয়া জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে লোকেরা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিত। কেহ বা দাঁড়াইয়া, কেহ বা বসিয়া, কেহ বা কাহারও স্কন্ধে হস্ত স্থাপন করিয়া, কেহ বা গালে হাত দিয়া, সকল অবস্থার লোক, বৃদ্ধ, যুবক, বালক সকলেই সেই স্থানে উপস্থিত হইত। তাহাদিগের বেশ এক একটা আলখাল্লা এবং তাহার উপর এক গরম চাদর ফেলা থাকিত। সকলেই দেখিতে সুন্দর, সবলশরীর ও জ্ঞানলাভে তৎপর। ইহারা সকল বিষয়েই কথা কহিত। জগতের আরম্ভ কি—কেহ বলিতেন বায়ু হইতে, কেহ বলিতেন জল হইতে, কেহ বলিতেন পরমাণু হইতে। আথেন্সবাসীদিগের জানিবার ইচ্ছা স্বভাবতঃ বলবতী ছিল। তাহারা সকল বিষয় জানিতে চাহিত, এবং সকল বিষয় জানিত। প্রত্যেকেরই এক এক জন গুরু ছিল। এই সকল জ্ঞানীরা এক এক দর্শন শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়া যথেষ্ট ধন ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেন। সক্রেটীস্ এক জন জ্ঞানী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহারও অনেক শিষ্য ছিল। সম্ভ্রান্ত যুবকদল তাঁহার জ্ঞানালোকে আলোকিত বলিয়া বিশেষরূপে আত্মগৌরব

করিত। কিন্তু সক্রেটিস্ জ্ঞান দিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না। তিনি যখন হাটে উপস্থিত হইয়া লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন, তখন তাহারা কি কথা শুনিত? সক্রেটিস বলিতেন, আপনাকে জান। তাহারা বলিত আমরা একথার অর্থ কিরূপে উদ্ভাবন করিব? তিনি বলিতেন আর কোন প্রকারে নহে, কেবল এই মাত্র জানিলেই হইল যে সকলেই সক্রেটিসকে জানাইত যে আমরা নানাপ্রকার বিষয় জানি। সক্রেটিস তাহাদিগকে বলিতেন, তোমরা কিছুই জান না, এইটিই জান, তাহা হইলেই তোমরা আপনাকে জানিবে। আপনি যে কি, অর্থাৎ আমি কিছুই জানি না, এইটি জানি। এই কথাটি এখনকার সকল দর্শন-শাস্ত্র এবং ধর্ম্ম তত্ত্বের মূল। ইহার নিগূঢ় তত্ত্ব সক্রেটিস দুই সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রচার করিয়া যান।

বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী দলে দলে দেশময় পর্য্যটন করিত। প্রত্যেক দলের এক এক জন গুরু ছিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ ছিল। সকলেই নিজ নিজ মতের আধিপত্য স্থাপনে যত্নশীল; এবং ইহাদিগের মধ্যে ঘোর তর্ক সর্ব্বদাই উপস্থিত হইত। পরব্রহ্ম লইয়া বিচার সর্ব্বদাই হইত। ব্রহ্মের স্বরূপ বিষয় লইয়া অনেকটা 'চুলচিরে' তর্ক হইত। দার্শনিকেরা ন্যায়শাস্ত্রানুমোদিত লক্ষণের সমূহ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মকে অবোধগম্য আত্মরূপে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ব্রহ্ম ইহা নহেন,

উহা নহেন করিতে করিতে, তিনি যে কি তাহা আর বুঝা যাইত না। সেই সকল ঋষি এবং সন্ন্যাসীরা ঘোর তর্কপ্রিয় ছিলেন। গৈরিক বসন পরিধান করিয়া কিম্বা একেবারে উলঙ্গ হইয়া তাঁহারা যথায় তথায় গমনাগমন করিতেন। বুদ্ধের সঙ্গে তাঁহাদের বিষম বিবাদ যখন তখন উপস্থিত হইত। কোন সময়ে দুইজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মস্বরূপবিষয়ে মীমাংসা করিতে না পারিয়া বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলেন। বুদ্ধ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কি ব্রহ্মকে দেখিয়াছ? তাহারা বলিলেন না। বুদ্ধ বলিলেন তবে ব্রহ্ম কিরূপ ইহা কিরূপে জানিতে পারিবে? তোমাদিগের পক্ষে এ প্রকার বিবাদ ন্যায়সঙ্গত নহে। অগ্রে ব্রহ্মকে দেখ, তবে তাঁহার বিষয় বলিও। ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধের নিকট অক্লেশে পরাভূত হইলেন। অনেকে বুদ্ধকে নিরীশ্বর বলেন; কিন্তু তিনি যে কি ভাবে নিরীশ্বর ছিলেন তাহা এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। বাস্তবিক ঈশ্বরকে না দেখিলে ঈশ্বরের বিষয় অভ্রান্ত মতে বলা যায় না। বুদ্ধ নিজে যে পথ প্রকাশিত করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়া গমন করিলেই ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হওয়া যায়। সহানুভূতি দ্বারা আমরা তাঁহার এই কথাটি বুঝিতে পারিতেছি।

ঈশা অনেক কথা বলিয়া গিয়াছিলেন যাহার মর্ম্ম কেবল এই প্রথা অবলম্বন করিলেই বুঝা যায়। তিনি যখন বলিয়াছিলেন কৈশরকে কৈশরের দ্রব্য দাও এবং ঈশ্বরকে ঈশ্বরের দ্রব্য

দাও, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার স্বর্গরাজ্যের সঙ্গে এ রাজ্যের কোনও সংস্রব ছিল না এবং ইহকাল দিয়া পরকালকে ক্রয় করা যায় না। তাঁহার স্বর্গরাজ্য এক নূতন ব্যাপার, তাহা কেহ কখন ভাবে নাই, কেহ জানে নাই। তাহার নূতন নিয়ম, নূতন প্রণালী, পৃথিবীর সঙ্গে তাহার কিছুই মিলে না। তারপর যখন ইহুদিরা তাঁহার নিকট একজন ব্যভিচারিণীকে লইয়া আসিল এবং বলিল—আপনি আজ্ঞা দিন, আমরা ইহাকে প্রস্তরাঘাত করিয়া মারিয়া ফেলি, ঈশা আর কিছু না বলিয়া ভূমিতলে লিখিয়া দিলেন—তোমাদিগের মধ্যে যাহার মনে পাপ নাই তিনিই প্রথম প্রস্তর নিক্ষেপ করুন। ইহাতে স্বর্গরাজ্যের নূতন বিধি কেমন সুচারুরূপে প্রকাশিত হইতেছে। কাহারও পাপীর বিচার করিবার অধিকার নাই। যিনি নিষ্পাপ বিচারপতি, তিনিই এই রাজ্যে বিচার করিবেন। ঈশা নিজেও বিচার করিলেন না। তিনি পার্থিবরাজত্বের দিক দিয়াও গমন করিলেন না। তারপর যখন ঈশা বলিলেন আমি এবং আমার পিতা এক, ধর্ম্ম যাজকেরা তাহা হইতে তখনই বুঝিলেন যে তবে ঈশাই ঈশ্বর। এ অর্থ যে কোনমতে ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা মনুষ্যের সামান্য জ্ঞানই অনায়াসে বলিয়া দিবে। ঈশা ঈশ্বর-পুত্র। পুত্র কিরূপে পিতা হইবেন ? ঈশা কিরূপে ঈশ্বর হইবেন ? একথাটা এত যুক্তিবিরুদ্ধ যে ইহা খণ্ডন করিতে বোধ হয় অধিকক্ষণ লাগে না; কিন্তু ইহার প্রকৃত অর্থ, আমরা যে প্রকার

বিষয় বলিয়াছি তাহা দিয়া পাই। যোগে বলিয়া ঈশা ঈশ্বরের সহিত একত্রীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কিনা অনুগত পুত্র ছিলেন, তাই পিতা ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই ছিলেন না। পিতা যাহা দিতেন, যাহা পরাইতেন, যাহা খাওয়াইতেন তাহাই তিনি লইতেন, পরিতেন এবং খাইতেন। তাঁহার নিজের কোন ইচ্ছাই ছিল না। সকলই পিতার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা-যোগে তিনি যোগী ছিলেন; এই ইচ্ছা যোগ তিনি জগতে প্রচার করিয়া যান। ইচ্ছাযোগ থাকিলে কি হয়? তিনি স্বেচ্ছাহীন হইলে, পিতা তাঁহার হৃদগত ভাবে প্রবেশ করিলেন। তিনি আর পিতা ছাড়া কাহাকেও দেখিতেন না; পিতার কথা, ও পিতার নাম ছাড়া কোন কথা শুনিতেন না, তাঁহার চক্ষু দিয়া পিতার জ্যোতি বাহির হইত, তাঁহার কর্ণ দিয়া পিতার নাম-ধ্বনি প্রবেশ করিত, তাঁহার জিহ্বা পিতার নাম কীর্ত্তন করিত, তাঁহার হস্ত পিতার কার্য্য করিত। তিনি যাহা করিতেন তাহা পিতার ইচ্ছাতেই করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা পিতার ইচ্ছা হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তিনি এবং পিতা এক। এক কিসে! স্বভাবে নহে, বস্তুতে নহে, শরীরে নহে, কেবল মাত্র ইচ্ছাতে। সহানুভূতি দ্বারা আমরা এই অদ্ভুত সংবাদটি পাই-তেছি। নববিধান আমাদিগকে এই তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিয়া-ছেন। ঈশা যে কি অমূল্য ধন ছিলেন তাহা আমরা নব-বিধান হইতে বুঝিতে পারিয়াছি। নববিধানের প্রথা ধর্ম্ম-সমূহকে বুঝিবার একমাত্র অভ্রান্ত প্রথা।

ঈশ্বর সাধন করিবার পক্ষে তীর্থ একটি প্রধান উপায়। তীর্থযাত্রার বিশেষরূপে নির্দিষ্ট কোনও সময় নাই, ইহার নিয়মও নাই। আমরা বলিয়াছি যে ভগবানের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করাই প্রত্যেক ভক্তের কার্য্য। পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মা হইয়া তিনি ভক্ত সমক্ষে প্রকাশিত হন। ভক্ত এই তিন প্রকার প্রকাশের প্রমাণ কায়মনোবাক্যে সকল সময়েই সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত থাকেন। এই জন্য তিনি সাধুজীবন এত শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করেন, এইজন্য তিনি বিজ্ঞান শাস্ত্র পাঠ করিয়া পিতার পিতৃত্বসংবাদ লাভ করেন। যে সকল মহাপুরুষ তাঁহাদিগের জীবনে এবং মরণে এই সকল ভাবের জীবন্ত প্রমাণ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের ভাব পরিষ্কার রূপে উদ্ভাবন করাই তীর্থশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। এই তীর্থ দ্বারা প্রত্যেক ভক্ত সাধুগণের চরিত্র আত্মস্থ করেন। তাঁহাদিগের জীবন, তাঁহাদিগের চরিত্র, ভাব এবং ধর্ম ভক্ত আপনার করিয়া লন। আত্ম-বিসর্জন করিয়া তিনি মহাপুরুষদিগকে আপনার করিয়া লন। সুতরাং তিনি জীবনের ভিতর সকল সাধু, সকল মহাপুরুষ, সকল বিজ্ঞানবেত্তাকে একত্রিত করিয়া সকলকার জ্ঞান ধর্ম্ম এবং বিশ্বাসকে আপনার করিয়া ফেলেন। তিনি সকলকার ভাবকে নিজ জীবনে দেখাইতে পারেন, এবং সকল-কার বলে আপনাকে বলীয়ান্ করেন। যিনি নববিধানকে বিশ্বাস করেন তাঁহার মত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন লোক আর কে আছে? অন্যান্য

ধর্ম্মের লোকেরা কেবল এক দেশের, কিম্বা এক জাতির, কিম্বা এক সময়ের সাধুতার উপর শ্রদ্ধা স্থাপন করে। তাহারা যেন একটি ক্ষুদ্রায়তন কুটীরে বাস করিয়া তদন্তর্গত বায়ু সেবন করে। তাহারা বাহিরের সকল লোককে অপদার্থ বলিয়া ঘৃণা করে। কিন্তু নববিধানবিশ্বাসী সমুদয় বিশ্বকে বিধাতার অভিনয়ক্ষেত্র মনে করেন। সকল দেশে, সকল জাতিতে তাঁহার অভিনয়। যেখানে মনুষ্যজাতি, সেইখানেই বিধাতার প্রকাশ। যেখানে তাঁহার প্রকাশ, সেইখানেই সাধুতা এবং ধর্ম্ম। নববিধানবিশ্বাসী ক্ষুদ্রকুটীরে বাস করিতে পারেন না। বিশাল আকাশরূপ চন্দ্রাতপের নিম্নে তাঁহার বাস, সমুদয় জগত তিনি বিধাতার লীলাভূমি বলিয়া বিশ্বাস করেন। যেখানে যতটুকু সাধুতা, যতটুকু ধর্ম্ম অভিনীত হইয়াছে তিনি সেই টুকু লীলাশাস্ত্রের অন্তর্গত করিয়া লন। তাঁহার মানবীয় স্বভাব সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্ট হওয়া চাই, সেইজন্য তিনি সকল বিধান আপনার মঙ্গলের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে মনে করেন। তিনি এক জীবনে সকল ধর্ম্মের অভিনয় করিতে পারেন। জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে তিনি সকল ভক্তেরই পরিচয় দিতে পারেন, সেই সেই অবস্থাতে তিনি কখন ঈশা, কখন মহম্মদ, কখন বুদ্ধ, কখন চৈতন্যের ভাব দেখান। তিনি এই সকল মহাপুরুষদিগের অনুগত শিষ্য। যখন ঈশার ভাব দেখান তখন তাঁহার, ঈশাই সম্প্রদায়ীর সঙ্গে কোন প্রভেদ থাকে না। তিনি বুদ্ধের প্রতি যে শ্রদ্ধা দেখান

সে বিষয়ে বৌদ্ধেরা তাঁহাকে হারাইতে পারে না। নববিধান বিশ্বাসীর কেহ শত্রু থাকিতে পারে না। তাঁহার এক শত্রু অবিশ্বাস, এবং নাস্তিকতা। এই অবিশ্বাস এবং নাস্তিকতার সঙ্গে তাঁহারি চিরসংগ্রাম। কিন্তু ধর্ম্ম কখন তাঁহার শত্রু নহে। তিনি সকল ধর্ম্মের আয়তন বৃদ্ধি করিতে চান, এবং ধর্ম্মসকলের খণ্ড খণ্ড ভাবকে একত্রিত করিতে চান। সুতরাং তিনি সকলের বন্ধু। তাঁহার ঐশ্বর্য্যের সীমা নাই। ভগবান দয়া করিয়া মনুষ্যকে যত মহাপুরুষরূপ রত্ন দিয়াছেন সে সকল রত্নই তাঁহার। যত ধর্ম্ম, যত বিদ্যা, যত জ্ঞান, যত সত্য তিনি মনুষ্যজাতির মঙ্গলার্থ পাঠাইয়াছেন তাহা সকলই তাঁহার। তাঁহার কিছুরই অভাব নাই। মনে করিলেই একটি সিন্দুক খুলিয়া তাহা হইতে রত্ন বাহির করিয়া লইতে পারেন। তিনি এই ধনসমূহ লাভ করিবার জন্য সাধনা করেন। তাঁহার তীর্থ আর কিছুই নহে কেবল এই মহৎ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডপতির ভাণ্ডার হইতে ধন আমরা চাহিলেই পাই। নববিধান বিশ্বাসী, তাহা কিরূপে চাহিতে হয় এই শিক্ষা চিরদিন ধরিয়া লাভ করেন; যখন কোন একটি অভাব হইল তখন সেই অভাবটি মোচন করিবার জন্য তিনি বিধাতার নিকট উপস্থিত হন এবং বিধাতা তাহাকে প্রত্যাদেশদ্বারা তীর্থে নিযুক্ত করেন। এই তীর্থ কোন বাহ্যিক ব্যাপার নহে। ইহা অন্তরের কথা। সহানুভূতি দ্বারা মহাপুরুষদিগের জীবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহাদিগের ভাব

আগ্রহ করার নামই তীর্থ করা। তীর্থ করিলেই বিধাতার লীলা-রহস্য বুঝা যায়। তীর্থ দ্বারাই আমরা তাঁহার প্রকাশ অনুভব করিতে পারি। তীর্থ দ্বারা আমরা দয়াময় হরির দয়া বুঝিতে পারি। সাধকেরা এই অমূল্য প্রথাকে যেন ক্রীড়ার সামগ্রী না করিয়া ফেলেন। অন্তরের ভিতর দিয়া অন্তরের ঈশ্বরকে পাইবার একটি পথ তীর্থসাধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যখন কোন বিধান আসে, তখন জগতের প্রকৃত অবস্থা কিরূপ তাহা বিবেচনা করিলে সেই বিধানের আবশ্যকতা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বিধান আসিবার পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস সমালোচনা করিলে বিধাতার উদ্দেশ্য জাজ্জ্বল্যমান হইয়া প্রকাশিত হয়। আমরা এতক্ষণ নববিধানের মূলমন্ত্র সকল পর্য্যালোচনা করিয়াছি। এখন আমাদিগকে উক্ত বিধানের আবশ্যকতার বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। ঠিক এই সময়ে নূতন বিধান আসিল কেন, জগতের এমন কি দুরবস্থা হইয়াছে যাহার জন্য বিধান আবশ্যক হইল, কোন্ কোন্ বিশেষ অভাব দূরীকরণের জন্য বিধাতা নূতন বিধি সৃষ্টি করিলেন, এ বিধানের প্রথা কি, কোন্ পথ দিয়া গমন করিলে বিধানের বিধাতাকে পাওয়া যায় এই সকল গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসার এখন আবশ্যক হইয়াছে। অতএব ক্ষণকাল পাঠককে লইয়া ইতিহাসপাঠে নিযুক্ত হইতে হইবে; তাহা হইলে আমরা যে সকল গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করিলাম তাহাদিগের মীমাংসা সুলভ হইবে।

নূতন বিধানের আগমন।

নববিধানের আবশ্যকতা স্থির করিতে হইলে সমুদয় জগতের বর্ত্তমান ইতিহাস বুঝিতে হইবে। জগতের ইতিহাস বুঝিতে হইলে আপাততঃ সুসভ্য ইউরোপ ও আমেরিকা এবং পুরাতন ভারতকে লইলেই চলিবে। কেবলমাত্রও ভারতকে লইলে আমরা জগতের বর্ত্তমান ইতিহাস বুঝিতে পারিব। যেহেতু ভারতে এখন পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের দুইটি স্রোত এককালেই বহিতেছে। ইংলণ্ডের রাজরাজেশ্বরীর অধীনস্থ ভারত আধুনিক সভ্যতা ও বিদ্যালোকে আলোকিত অথচ ইহা প্রাচীনতম সভ্যতার আদিম নিবাস। সেই এক হিমালয় হইতে গঙ্গা প্রবহমানা এবং সেই হিমালয় হইতে শাস্ত্রালাপ ও জ্ঞান প্রথম উদিত। পুরাতন শাস্ত্র, পুরাতন দর্শন,ও পুরাতন ধর্ম্ম, আধুনিক ইউরোপের শাস্ত্র এবং বিজ্ঞানের সহিত একত্রিত হইয়াছে। একত্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মিশ্রিত হইতে পারে নাই। দেশের কল্যাণের জন্য, জগতের মঙ্গলার্থে এখন সেই দুটি সভ্যতা, সেই তৈল এবং জল মিলিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। আমরা বলি নববিধান সেইজন্য স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই দুই পুরাতন ও আধুনিক সভ্যতা পরস্পর মিলিতে পারে নাই। বরং উভয়ে ঘোর যুদ্ধ চলিতেছে। এই সংগ্রামের ভাল মন্দ ফল আমরা সকলেই আস্বাদন করিতেছি। তাহার মধ্যে একটি মন্দ ফল এই যে আমরা কোন একটি সভ্যতার আশ্রয় লইয়া সুখী হইতে পারিতেছি না। যে দিন

হইতে ইউরোপীয় সভ্যতা এদেশে আসিয়াছে সেই দিন হইতে আমাদিগের শান্তি চলিয়া গিয়াছে। আমাদিগের ধর্ম্ম এক প্রকার, ইউরোপের ধর্ম্ম আর এক প্রকার। আমাদিগের ধর্ম্মে এক প্রকার প্রবৃত্তি এবং কার্য্য হয়, ইউরোপের ধর্ম্মে আর এক প্রকার প্রবৃত্তি এবং কার্য্য হয়। আমরা চাই অনন্ত যোগ, অনন্ত বিশ্রাম; ইউরোপীয়েরা চায় অনবরত কার্য্য, অনন্ত কার্য্যশীলতা। আমাদিগের দেশে শাস্ত্র এবং ব্রহ্মতত্ত্ব একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে, এবং ইউরোপে বিজ্ঞান আসিয়া সমুদয় শাস্ত্রকে বিচলিত করিয়া দিতেছে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য প্রচারকদল ভারতে আগমন করিয়াছেন। কিন্তু সেই প্রচারকদলের পশ্চাতে পশ্চাতে বিজ্ঞানবেত্তারা আসিয়া বলিয়া দিতেছেন প্রচারক দলের কথা শুনিওনা, তাঁহারা যে সকল মত প্রচার করিতেছেন সে সকল মত ভ্রান্ত। এইরূপে নূতনে পুরাতনে, ও নূতনে নূতনে ক্রমাগত সংগ্রাম চলিতেছে। আমরা হতবুদ্ধি হইয়া কোনও দিক না লইয়াও সংগ্রামের বিষময় ফলগুলি সমস্তই আস্বাদন করিতেছি। আমরা জানি যে এই ভারতে শান্তি স্থাপন হইলেই জগতে শান্তিস্থাপন হইবে। শান্তি হওয়া আবশ্যক যে হেতু শান্তি স্থাপন না হইলে এ দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে কখন অগ্রসর হইবে না।

এখন প্রাচীন সভ্যতার বর্ত্তমান অবস্থা কি তাহা পর্য্যালোচনা করা উচিত। সেই এক ঈশ্বর হইতে ভারতের

তেত্রিশ কোটী দেবদেবীর সৃষ্টি হইয়াছে। সেই ঘোর পুরাকালে হিমালয়ের নীহারমণ্ডিত শিখররাশিকে লক্ষ্য করিয়া গুহামধ্যে ঋষিগণ একমাত্র পরব্রহ্মের ধ্যান করিতেন। তখন তাঁহাদিগের কত জ্ঞান, কত বল, কত প্রতাপ ছিল। তাঁহাদিগের একটি একটি বাক্যের সহিত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত, এক এক নিশ্বাসে স্বর্গের প্রত্যাদেশ নির্গত হইত। ভারতের গভীর চিন্তা, গভীর ধ্যান, অপূর্ব্ব শাস্ত্ররহস্য, আলোচনার নূতনত্ব এ সবই সেই সময়কার। নবপ্রভাবে এমন ভাষা সৃষ্ট হইল যে তাহা এখন পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। মনের ভাব ভাষার মধ্য দিয়া নির্গত হয়। যেমন ভাব হইবে তদনুরূপ ভাষাও হইবে। আমাদিগের ঋষিরা কত প্রকারে মনকে সঞ্চালনা করিতেন, কত নূতন পথ দিয়া মনকে লইয়া যাইতেন, কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবকে মনে স্থান দিতেন তাহা সকলই এক সংস্কৃত ভাষার অদ্ভুত গঠনে ও রচনা কৌশলে প্রতীত হয়। এখন পর্য্যন্ত আমরা ধর্ম্মবিষয়ে কিম্বা মনোবিজ্ঞানবিষয়ে কিম্বা ঈশ্বরতত্ত্বসম্বন্ধে সকল ভাব সংস্কৃত ভাষায় সুচারুরূপে প্রকাশ করিতে পারি। সুতরাং ভারতের পূর্ব্বগৌরব বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা পর্য্যালোচনা করা উচিত। এই ভাষা একটি সুন্দর আরশি, ইহাতে আমাদিগের দেশের পূর্ব্বকার ভাব সকল এখনও আশ্চর্য্য ও পরিষ্কার রূপে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। বল দেখি এমন কোন্ আশা, কোন্ পরীক্ষা, কোন্ সংগ্রাম, কোন্ স্তব, কোন্

প্রার্থনা, কোন্ ধ্যান মনে স্থান পায় যাহা সংস্কৃত ভাষাদ্বারা পরিস্ফুটস্বরে প্রকাশ করা যায় না। এক পরব্রহ্মবিষয়ক যত প্রকার স্তব, ধ্যান, চিন্তা হইতে পারে তাহা সব আমরা সেই ভাষায় দেখিতে পাই। সংস্কৃত ভাষাই বলিয়া দিতেছে যে এক অনন্ত পরব্রহ্মই পুরাতন ভারতের একমাত্র অধিকার এবং গৌরব ছিল।

সেই অনন্ত পরব্রহ্ম আর আমাদের নাই। খণ্ড বিখণ্ড হইয়া তিনি আজ তেত্রিশ কোটি জীবে ভারতবাসীদিগের আংশিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাগী হইয়াছেন। ভারতের মস্তিষ্ক এক সময়ে অনন্তকে ধারণ করিতে পারিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে সেই মস্তিষ্ক ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে বলিয়া সেই অনন্তের এক টুকরাকেও ধারণ করিতে পারিতেছে না। ভারতের হৃদয় এক সময় এত বড় ছিল যে সমুদয় অনন্তকে বুকে ধরিয়া ভাল বাসিতে পারিত, ও শ্রদ্ধা এবং ভক্তি দেখাইতে পারিত। এখন সেই হৃদয় এত ক্ষুদ্র এবং সঙ্কুচিত হইয়াছে যে একটি সামান্য খণ্ডও সেই হৃদয়ে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান পায় না। এ বড় অদ্ভুত পতন। কোথা হইতে এই প্রকাণ্ড মস্তিষ্ক, ও এই প্রকাণ্ড হৃদয় এত সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল ? কি কারণে ভারতের গৌরব এত সহসা তিরোহিত হইল ? কারণও জানিনা, উদ্দেশ্যও জানিনা। তবে এই মাত্র জানি যে ভারতের গৌরব অনন্ত ব্রহ্মের সহিত, গ্রথিত। সেই অনন্ত ব্রহ্মকে আবার হৃদয়ে স্থান না দিতে পারিলে ভারতের গৌরব আর ফিরিবে না। ভারতসন্তান-

দিগের এখন আর অন্য কোন চিন্তা ও কোন সাধন হওয়া উচিত নহে। কেবল ব্রহ্মকে কিরূপে ফিরাইয়া আনা যায়, ইহাই তাহাদের একমাত্র চিন্তা ও একমাত্র সাধন হওয়া উচিত।

পুরাণে কথিত দক্ষযজ্ঞ রূপকটি ভাল করিয়া বুঝিলে ঘটনাটি বস্তুবিক কি তাহা আমরা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। জগদ্‌ব্রহ্ম জগৎপতির নাম মহাদেব, তাঁহার স্ত্রীর নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি পুরুষের মিলন শাস্ত্রকারেরা অনুভব করিয়া গিয়াছেন। মহাদেব প্রকৃতিকে স্নেহের সহিত ও যত্নের সহিত রক্ষা করিতেন এবং প্রকৃতি সতী স্বামীপরায়ণা হইয়াছিলেন। হঠাৎ মানবসমাজে মহাদেবের নিন্দা সতীর কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। সতী কি কখন পতিনিন্দা সহ্য করিতে পারেন? তিনি সকলের সম্মুখে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রকৃতির মৃত্যু হইলে কথিত আছে যে ব্রহ্মা তাঁহার শবকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন এবং এক এক খণ্ড এক এক দেশে আসিয়া পড়িল। যে স্থানে কোন খণ্ড পড়িল সেই স্থান আজ পর্য্যন্ত এক পীঠস্থান হইয়া আছে এবং সেই স্থানে আজও সেই খণ্ডের পূজা হয়। এ রূপকটির অর্থ কি? নানা ভাব লইয়া মানবপ্রকৃতির গঠন। মনুষ্য যত জ্ঞান চর্চ্চা করিবে, যত ভক্তি সাধন করিবে, যত অধিক কর্ত্তব্যপালন করিবে, যত উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবে, তত তাহার ভিতরে এই প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করিবে। কিন্তু

যে যত সঙ্কীর্ণ হইবে, যত যাহার জ্ঞান সঙ্কুচিত হইবে, যাহার কর্ত্তব্যবোধ যত পৃথিবী হইতে অবসন্ন লইয়া দেশে সীমাবদ্ধ হইবে, দেশ হইতে গ্রামে, গ্রাম হইতে পরিবারে, পরিবার হইতে আপনার ভিতরে আসিয়া সীমাবদ্ধ হইবে, তত তাহার প্রকৃতি ক্ষুদ্র এবং ক্ষীণ হইয়া যাইবে। ভারতবাসীদিগের পক্ষে ঠিক এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। তাহারা পূর্ব্বে পূর্ণব্রহ্মে শ্রদ্ধা ভক্তি দিতে পারিত, মস্তিষ্কের সমুদয় বৃত্তি চালনা করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানকে সমালোচনা করিত, মানবসমাজের উপর তাহাদিগের ক্ষমতা এবং অধিকার ছিল। ক্রমে মানসিক বৃত্তি ক্ষীণ হইতে লাগিল, দৃষ্টি বর্ত্তমানেই সীমাবদ্ধ হইল, ভবিষ্যৎ দেখিবার ক্ষমতা চলিয়া গেল, এবং কেবল আপনার আপনার করিয়া থ কিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাদের প্রকৃতিও ক্ষুদ্র হইল। পূর্ণ ব্রহ্মকে আর ধারণ করিতে পারিল না। এখন যোগের ঈশ্বর, ভক্তির ঈশ্বর, জ্ঞানের ঈশ্বর, কার্য্যের ঈশ্বর, রুদ্রের ঈশ্বর, রোগের ঈশ্বর, বিপদের ঈশ্বর, প্রকৃতির ঈশ্বর, জাতির ঈশ্বর, পরিবারের ঈশ্বর, একটি একটি বৃক্ষের ঈশ্বর, পুষ্করিণীর ঈশ্বর, যুদ্ধের ঈশ্বর, অভাবের যত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একটি একটি ঈশ্বর হইতে পারেন, সেই সকল ঈশ্বরের পূজা আরম্ভ হইল। ক্ষুদ্রপ্রকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বর হইল। আর সমদৃষ্টি রহিল না, উদারতা রহিল না, ভূত ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবার ক্ষমতা রহিল না, কেবল আমি সব, আমার পরিবার সব, আমার গ্রাম সব, আমার বর্ত্তমান অভাবটি সব এই প্রকার

ভার আসিয়া পড়িল। একটি রোগ হইল, সেই রোগের দেবতাকে ডাকিলাম, সিদ্ধি কামনা করিলাম, ও সেই সিদ্ধিদাতা একটি ক্ষুদ্র দেবতাকে ডাকিলাম। সমুদয় দেশের প্রতি কত সুমাদর, কত স্নেহ ছিল, এখন তাহা গ্রামে, নিজবাটীতে সীমাবদ্ধ হইল। দেশহিতৈষিতা, মানব সমাজের প্রতি অনুরাগ, সকলই চলিয়া গেল। আর কেহ দেশের জন্য প্রাণ দিল না। পরিবারই সমস্ত, আমিই সমস্ত। অনুরাগ যত্ন, পরিশ্রম, প্রাণ দান, ত্যাগস্বীকার কেবল গ্রামে, পরিবারে এবং নিজের মধ্যে সংরক্ষিত হইল। সুতরাং দেশের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। ইহার উপর আবার জাতিভেদ। এই জাতি-ভেদ ধর্ম্মের সহিত এত দৃঢ়ভাবে গ্রথিত আছে যে কোন প্রকারে তাহা বিচ্ছিন্ন হইবার নহে। ভারতবাসীরা সেই জন্য কখন এক হইতে পারে না। কোন একটি লক্ষ্য সমুদয় হিন্দুজাতির হইতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন জাতি একটি একটি বিশেষ লক্ষ্য লইয়া আছে। পরস্পরের সদ্ভাব নাম মাত্র হইয়া থাকে। একতা, মিল, সমবেত চেষ্টা, দেশের হিত চেষ্টা এ সকল অন্যান্য দেশে সম্ভব, কিন্তু হিন্দুজাতির মধ্যে ইহা কখনই হইতে পারে না। এখানে পরস্পর বিরোধই প্রধান জাতীয় লক্ষণ। সকলে আপনার আপনার করিয়া ব্যস্ত। সকলই ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, সঙ্কুচিত ;—দেশ-ব্যাপ্তভাব কখনই দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এদেশে কোন বিষয়ে সমবেতচেষ্টা হইতে পারে না। শত শত সম্প্রদায় দেশকে বিভক্ত করিয়া আছে। পূজায় বিভিন্ন, আচার ব্যব-

ধ্যায়ে বিভিন্ন, নীতিতে বিভিন্ন, সামাজিক নিয়মে বিভিন্ন। বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এক প্রেমে উত্তেজিত হইয়া দেশশুদ্ধ লোক এক ঈশ্বরকে পূজা করিবে, এক ধর্ম্ম পালন করিবে,এক নীতির অনুসরণ করিবে ইহা কথনও আশা করা যাইতে পারে না। এখানে ধনীদের এক প্রকার ধর্ম্ম, নির্ধনদের আর এক প্রকার ধর্ম্ম; ব্রাহ্মণদের এক প্রকার, শূদ্রদের আর এক প্রকার। পণ্ডিতেরা যাহা লইয়া থাকেন, মূর্খেরা তাহা চায় না। পুরুষদিগের ধর্ম্ম এক প্রকার, স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্ম আর এক প্রকার। রাজায় প্রজায় গভীর প্রভেদ। বিরোধই ভারতের লক্ষণ। এখানে ভ্রাতৃভাব হইতে পারে না। ঈশ্বর পিতা,মানব ভ্রাতৃমণ্ডলী,এমত ভাব এখানে স্থান পায় না। এ দেশের লোকেরা যে চিরদিন পরাধীন থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? সহস্রাধিক বৎসর ধরিয়া আমরা বিজাতীয়দিগের দ্বারা পারাভূত হইয়া আসিতেছি। আমরা দাস হইয়া আছি, এবং চিরদিন দাস হইয়াই থাকিব। যত দিন অনৈক্য, বিরোধ,জাতিভেদ, পরস্পরের হিংসা,দ্বেষ, ঘৃণা থাকিবে ততদিন আমাদিগকে অন্য জাতির অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। স্বাধীনতার মূলে ঐক্য, ভ্রাতৃভাব, আত্মমর্য্যাদা, ধর্ম্ম, সাহস, বল এ সকলই থাকা চাই। কিন্তু জাতিভেদ এবং ধর্ম্মভেদ বশতঃ এ সকল কিছুই হইবার সম্ভাবনা নাই। এক ঈশ্বর হইলে এক ধর্ম্ম হইবে, এক ধর্ম্ম হইলে এক জাতি হইবে, এক জাতি হইলে ভ্রাতৃভাব হইবে, ভ্রাতৃভাব হইলে বিরোধ, বিসম্বাদ

দ্বেষ, হিংসা সকলই চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে সম্মেত চেষ্টাও হইবে, এক প্রণালীতে শিক্ষা হইবে, শিক্ষা হইলে উচ্চ আশা হইবে, উচ্চ আশা থাকিলে নব বল, নব উদ্যম উভয়ই হইবে; এবং ইহাতেই উন্নতি হইবে। ইহা একটি বিধানের কার্য্য। যত গুলি খণ্ড খণ্ড ঈশ্বর আছে, সকলকে মিলিত করিয়া এক ঈশ্বরে পরিণত করিতে হইবে। ইহা কেবল নববিধান করিতে পারে, এবং সেই জন্য নববিধান ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারতের ভবিষ্যৎ এই বিধানের হস্তে। বিধান, উচ্চ ধর্ম্ম, উচ্চ নীতি, একতা, ভ্রাতৃভাব, স্বাধীনতা এ সকলই পরস্পর পরস্পরের প্রতিশব্দ। একটি হইলে আর সকলই আসিবে।

ভারতের উদ্ধারের জন্য নববিধান। খণ্ড খণ্ড ঈশ্বরকে একত্রিত করিয়া সেই পুরাকালের এক ঈশ্বরকে আনয়ন করা এক ঈশ্বরের রাজ্যে এক মিলিত ভ্রাতৃমণ্ডলী স্থাপন করা, জাতিভেদ দূর করিয়া বিশ্বাস, প্রেম, দেশহিতৈষিতাকে হৃদয়ের অলঙ্কার করা, ইহাই নববিধানের কার্য্য। বাস্তবিক অনেক রোগ, অনেক অভাব, অনেক পাপ না হইলে দেশে বিধান আসে না। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে নূতন ধর্ম্ম না আসিলে ইহাকে রক্ষা করা সুকঠিন। উপধর্ম্ম আমাদিগের সমুদয় প্রাণ, মন, বলকে হীন করিয়া দিয়াছে। জাতিভেদ, দেশহিতৈষিতা ও সমবেত-চেষ্টার সম্ভাবনাকে একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে। আর

আমরা যে অনেক দিন ভারতের পূর্ব্বমহিমাকে লইয়া উপ-জীবিকা করিব তাহার আর কোন আশা ভরসা নাই। ক্রমে ক্রমে ইহার অবনতি হইতেছে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান রাজপুরুষেরা এ দেশ হইতে বিদায় হন, তাহা হইলে আর কোন জাতি আসিয়া আমাদিগকে দাস করিয়া ফেলিবে। আমাদিগের এমন বল থাকিবে না, এমন ঐক্য থাকিবে না যে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কাহারও বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই। ভগবানের অসীম করুণা যে তিনি আমাদিগের দশা দেখিয়া আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন। এই বিধানই আমাদিগের দেশের একমাত্র পরিত্রাণ এবং মুক্তির উপায়।

কিন্তু ভারত বলিলেই ইহার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ এবং ইউরোপ বলিতে গেলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী আমাদিগের বিধান-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। কোন অদ্ভুত রহস্য-সূত্রে ইংলণ্ড ও ভারত, পূর্ব্ব ও পশ্চিম একত্রিত হইয়াছে। স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উভয়ের অনেক দান করিবার ও গ্রহণ করিবার আছে। আমাদিগকে অনেক পরিমাণে পাশ্চাত্যভাব লইতে হইবে, এবং ইংলণ্ডকেও প্রতীচ্যভাব গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব্ব পশ্চিমের সামঞ্জস্য ভারতবর্ষেই হইবে, এবং উভয়ের ভাব এক প্রকার আধ্যাত্মিক রাসায়নিক যোগে একত্রিত হইলে একটি নূতন ভাব, নূতন ধর্ম্ম, নূতন জাতি উৎপন্ন হইবে। এই সামঞ্জস্য, এই যোগ কেবল আমাদিগের বিধানই করিয়া দিতে পারে

ভারতের যেমন অনেক অভাব, অনেক রোগ আছে, ইউরোপেরও ঠিক তাহাই। এখানে অনন্ত ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া সকল স্থান, সকল পদার্থ একটি একটি অধিষ্ঠাত্রী দেবতায় পূর্ণ হইয়া আছে। এখানে আকাশে দেব, জলাশয়ে দেব, বৃক্ষে দেব, ধনধান্যে দেব, অন্নে দেব, বস্ত্রে দেব—ভারতবর্ষ দেবতায় পূর্ণ। এখানে জীবনের প্রতিকার্য্য দেবতাদিগের সহায় লইয়া হয়। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ সকলই দেবতাকে লইয়া। এক হিসাবে ভারতের ন্যায় ধার্ম্মিক দেশ পৃথিবীতে নাই। ইউরোপ কিন্তু ইহার বিপরীত দিকে গমন করিতেছে। সেখানেও ভারতের ন্যায় সাম্প্রদায়িক ভাব শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের জন্য কত যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অসংখ্য লোকের প্রাণনাশ হইয়াছে। কত লোক অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রতি পদে পদে এখন ঐ ধর্ম্মের লাঞ্ছনা হইতেছে। আজকাল ইউরোপ মহাখণ্ড এক প্রকাণ্ড যুদ্ধের শিবির। প্রতি দেশ, প্রতি জাতি অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সজ্জিত আছে। এক মুহূর্ত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরস্পরের গলা কাটাকাটি করিতে পারে। জাতিতে জাতিতে শত্রুতা ত আছেই। আবার "প্রত্যেক দেশে নির্ধন ধনীদিগের বিপক্ষে, প্রজারা রাজার বিপক্ষে, নাস্তিকেরা ধার্ম্মিকের বিপক্ষে খড়্গহস্ত হইয়া আছে। ধনীদিগের হস্তে এত ঐশ্বর্য্য থাকিবে, আর আমরা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, অথচ ধনীরা আমাদিগের অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে,

এই ভাণ করিয়া নির্ধনেরা ধনীশ্রেণী একেবারে উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত। আর দেশে ধনী থাকিবে না। যে যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা রাজভাণ্ডারে গচ্ছিত হইবে এবং দেশের লোকেরা জাতি বা শ্রেণী নির্বিশেষে সেই ভাণ্ডার হইতে সকলেই নিজ নিজ অংশ পাইবে। যে যাহা কার্য্য করিবে তাহা নিজের জন্য করিবে না, সাধারণ হিতের জন্য করিবে। এইরূপে সকলে যাহা উপার্জ্জন করিবে তাহা সকলের হিতের জন্য গচ্ছিত থাকিবে। কিন্তু ধনীরা তাহাদিগের নিজ উপার্জ্জিত ধন অন্যকে দিবে কেন? এই জন্য ধনীদরিদ্রে মহাযুদ্ধ চলিতেছে। এ যুদ্ধে ধনীরা যে জয়ী হইয়া আসিতে পারিবে তাহাতে বিশেষ সন্দেহ আছে। অন্য দিকে প্রজারা রাজার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। তাহারা বলে যে রাজা কেবল ঘটনাক্রমে রাজা হইয়া জন্মিয়াছেন বলিয়াই কেন আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবেন? আমাদিগের উপর আধিপত্য করিবার তাঁহার কোন অধিকার নাই। দেশ আমাদের, আমরাই আমাদিগের নিজের উপর আধিপত্য করিব। এই ভাবে উত্তেজিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা মহাখণ্ডে কোন কোন স্থানে রাজা আর নাই। সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ইংলণ্ডে দিন দিন সাধারণমণ্ডলীর ক্ষমতা বাড়িতেছে, রাজ্ঞীর ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে কমিতেছে। ঐশ্বর্য্য যাইবে, রাজারা যাইবে, আবার ধর্ম্ম যাইবে এবং ঈশ্বরও যাইবেন। এখনকার বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রমে নিরীশ্বর হইয়া পড়িতেছে। নিয়মাধীন

ঈশ্বরের এত দুর্গতি যে, তিনি আর আপনার সৃষ্টি দেখিতে পাইতেছেন না। পণ্ডিতেরা এমন যুক্তিবঙ্গ প্রদর্শন করিয়াছেন যে তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার আর প্রয়োজন হইতেছে না। জীব জন্তুর সৃষ্টি হইয়াছে ইহা না' মানিলেও চলে। উচ্চ শ্রেণীর জীব নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ক্রমাগত জীবনের দায়ে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। আত্মরক্ষা করিতে গিয়া একটি একটি বিশেষ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বর্দ্ধিত হইতেছে। তাহাতে একটি নূতন জাতি উদ্ভূত হইতেছে। এইরূপে জগতের জীবসমূহ উৎপাদিত হইয়াছে। প্রকৃতিতে যে সকল শক্তি নিহিত আছে তাহাদিগের বলে নূতন নূতন জীব উৎপন্ন হইতেছে। আর ঈশ্বর থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই। মানব-সমাজ, মানব-নীতি, মানব আচার ও ব্যবহার এই প্রকারে আপনা আপনি উদ্ভূত হয়। সুতরাং আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি। আমরা বলি যে, মানব-হৃদয়ে বিবেক অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞান নিহিত আছে, তাহা ঈশ্বরপ্রদত্ত। পণ্ডিতেরা বলেন যে, বিবেক মনুষ্যেরা experience হইতে পাইয়াছেন। অবস্থায় পড়িয়া, পরীক্ষায় পড়িয়া তাহারা কোন্ কাজটি করা উচিত কোন্‌টি করা উচিত নহে তাহা জানিতে পারিয়াছে। আমরা বলি বিবাহ দৈবঘটিত ব্যাপার। ইহার জন্য ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া ও প্রণালী আবশ্যক। ঈশ্বরকে সাক্ষী রাখিয়া নব দম্পতির বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হওয়া উচিত। পণ্ডিতেরা বলেন বিবাহ দৈব ব্যাপার

কিছুই নহে। ইহা দম্পতির স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। ইহাতে স্বর্গের ব্যাপার কিছুই নাই। দুই দিকের মধ্যে যে একটি contract হয় তাহাই বিবাহ। সুতরাং contract যেমন গড়া যায় কিম্বা ভাঙ্গা যায়, ইহাও তেমনি গড়া যায় এবং ভাঙ্গা যায়। ইহার কার্য্য আর কিছু নহে কেবল রাজ-পুরুষদের সম্মুখে বলা যে, আমরা দুজনে স্ত্রী পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইতে চাই; এবং ইহার সাক্ষী ঈশ্বর নহেন, দুই জন মানুষ সম্মুখে থাকিলেই হয়। এইরূপে বিবাহটি ক্রমে ক্রমে নিরীশ্বর হইয়া আসিতেছে। বিদ্যাশিক্ষার ভিতর ধর্ম্মশিক্ষা আসিতে পারে না। জগৎপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিলে আমরা মোটামুটি এই দেখিতে পাই যে, পৃথিবীর সকল পদার্থেই জ্ঞানের পরিচয় আছে। মানব-শরীরে চক্ষু কি অপূর্ব্ব জ্ঞানের প্রমাণ দিতেছে। অবশ্য একজন জ্ঞান-ময় পুরুষ এই বিশ্ব সৃজন করিয়া তাহাতে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছেন। মৎস্যেরা জলে সন্তরণ করে, সরীসৃপেরা বুকের উপর ভর দিয়া ভূমিতে বিচরণ করে, পক্ষীরা পক্ষযুক্ত হইয়া আকাশে উড়ে, এই কয় প্রকার জীবের অঙ্গপ্রণালী কি আশ্চর্য্যরূপে গঠিত হইয়াছে। ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গে জ্ঞান যেন বড় বড় অক্ষরে লিখিত আছে। বিজ্ঞান পড়িয়া ঈশ্বরকে না বিশ্বাস করিয়া থাকা যায় না। কিন্তু এখনকার বিজ্ঞানবেত্তরা এই সকল পদার্থে জ্ঞান-কৌশল কিছুই দেখিতে পান না। অবস্থায় পড়িয়া জীবন রক্ষা করিতে

গিয়া মৎস্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডানা হইয়াছে, সরীসৃপের মাংসপেশী এত কঠিন ও বলবান হইয়াছে এবং পক্ষীর ডানা ছত্রের ন্যায় উপর দিকে স্ফীত এবং নিম্ন দিকে গহ্বরবৎ হইয়াছে। আমি যদি বলি যে, এ সকল পদার্থে ঈশ্বরের জ্ঞানই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে এখনকার পণ্ডিতেরা আমার কথাকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিবেন। পৃথিবীতে ঈশ্বরের আর স্থান নাই। সুতরাং ঈশ্বর ঈশ্বর না করিয়া মনুষ্যের ভিতর যে বিশুদ্ধ জ্ঞান আছে তাহারই চর্চ্চা ও আলোচনা করা উচিত।

বিগত শতাব্দীর শেষে ফরাসি দেশে এই নিরীশ্বর মত লইয়া মহা হত্যাকাণ্ড পড়িয়া গিয়াছিল। সেখানে ধন, রাজা, এবং ঈশ্বর এই তিনের বিরুদ্ধে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। এবং যুদ্ধে তিন জনই পরাস্ত হইলেন। ফরাসিরা রাজদ্রোহ করিয়া, রাজা ও রাণীকে হত্যা করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল, ধনীলোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ নির্ব্বাসিত, কেহ কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়, অনেকের প্রাণদণ্ড হয়, এবং সকলকারই বিষয়সম্পত্তি অপহৃত হইয়া রাজকোষে আনীত হয়। অবশেষে তাহাদিগের মস্তিষ্ক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এতদূর বুদ্ধিহীন হইয়া পড়ে যে, তাহারা একদিন বিজ্ঞাপন দিয়া ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিল। "আজ হইতে ঈশ্বর নাই" এই কথা প্রচার করিয়া জ্ঞানের প্রতিমূর্ত্তি স্ত্রীরূপী করিয়া তাহার পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিল। এই ভয়ানক

বিদ্রোহে কত লোকের যে প্রাণ গিয়াছিল, সমাজের কত অনিষ্ট হইয়াছিল, পৃথিবীকে কত পরিমাণে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছিল তাহা কে নির্ণয় করিতে পারে ? এই নিরীশ্বর-পরীক্ষা সৌভাগ্যক্রমে অনেক দিন হইতে পারে নাই। কালক্রমে ফরাসিদেশ অনেকটা সুস্থির হইতে পারিয়াছিল। কিন্তু সেই পরীক্ষার গরলময় ফল সমগ্র ইউরোপখণ্ডকে আজও ব্যথিত করিতেছে। সে রাজবিদ্রোহ চলিয়া গিয়া ঈশ্বর-বিদ্রোহ এখনও চলিতেছে এবং কত দিন চলিবে তাহা কে বলিতে পারে ?

এক দিকে ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক ভাব ধর্ম্মকে বলহীন, মর্য্যাদাহীন করিয়া ধর্ম্মে অবিশ্বাস উৎপাদন করিয়া দিতেছে, অন্য দিকে বিজ্ঞান আসিয়া পৃথিবীকে নিরীশ্বর করিতেছে। এ অবস্থায় নববিধানের কি কার্য্য আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি। ঘোর অভাব এবং বিপদ দেখিয়াই বিধাতা তাঁহার বিধানকে প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষে খণ্ড খণ্ড ঈশ্বরকে একীভূত না করিলে ভারতের রক্ষা নাই। সকল জাতি একত্র করিয়া, সকল ধর্ম্মকে এক করিয়া ভারতবর্ষে একতা, ভ্রাতৃভাব, এবং বলপ্রেরণ করাই নববিধানের বিশেষ কার্য্য। ইহা ব্যতীত ভারতের যোগভক্তি উদ্দীপিত করিবার জন্য, তাহা চিরফলদায়ী করিবার জন্য আমাদিগকে ইউরোপের বিজ্ঞান এবং কার্য্যোদ্যম লইতে হইবে। এ দেশের ধর্ম্মসমূহ ইউরোপের ধর্ম্মসমূহের সহিত সমন্বয়

হইলেই এই দুই মহার্থের ভাব একীভূত হইতে পারিবে। আমাদিগের দেশে যোগভক্তির প্রাধান্য আছে। কিন্তু সেই যোগভক্তি আমাদিগকে কার্য্য ও বিজ্ঞানের প্রতি উদাসীন করিয়া ফেলিয়াছে। এ দুটি না হইলে আমাদিগের মাতৃভূমির উন্নতি হইবে না। আমরা সমুদয় মানবজাতির এক অঙ্গ, সমুদয় মানবজাতির সহিত আমাদিগের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ থাকিবে। ঈশ্বর পিতাভাবে আছেন, পুত্রভাবেও আছেন, এই বুঝিয়া আমাদিগের বিজ্ঞানশাস্ত্র পাঠ করিতে হইবে, সমুদয় ইতিহাস আলোচনা করিতে হইবে; তাহা করিলে পিতাতে বিশ্বাস জ্বলন্ত হইবে এবং পুত্রত্ব লাভ করিয়া আমরা কর্ত্তব্য পালন করিতে শিখিব। ধর্ম্মজগতে বিশ্বাসই মনুষ্যের মূলমন্ত্র এবং কর্ত্তব্যপরায়ণতা মুক্তির একমাত্র উপায়। এই দুই লাভ করিতে গেলে সত্যের প্রতি আদর, পরিশ্রম, আগ্রহ, দয়া, উদ্যম, বীরত্ব এ সকলই আবশ্যক। এ সকল গুণ আমরা সমন্বয়ের ধর্ম্ম হইতে লাভ করিব। ভগবান্ পিতা হইয়া বা পুত্র হইয়া বা পবিত্রাত্মা হইয়া যেখানে লীলা করিতেছেন আমরা সেই স্থানে গিয়াই তাঁহার আলোচনা করিব। ইহাতে জাতিবিচার করিলে চলিবে না, হিন্দুম্লেচ্ছের ভাব আসিলে চলিবে না, অলস উদাসীন হইলে চলিবে না, কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া আকাশমার্গে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলে চলিবে না। যোগ, ভক্তি, কার্য্য, জ্ঞান এই চারি পদার্থের প্রয়োজন। অগাধ ভক্তি, অবিশ্রান্ত যোগ ও কার্য্যপরতা,

সত্যের প্রতি একান্ত অনুরাগ এবং ইহারি সঙ্গে প্রেমের উন্মত্ততা এই সকল গুণ একাধারে না মিলিলে হিন্দুজাতির পরিত্রাণ হইবে না এবং ঐই পরিত্রাণ দিতেই নববিধান পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে।

ও দিকে ইউরোপে সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকে একেবারে বিকলাঙ্গ করিয়া দিয়াছে। যে সকল মহান্ সত্য, মহামতি ঈশা প্রচার করিয়া যান তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে আর দৃষ্ট হইতেছে না। ভ্রাতৃভাব, শান্তি, চরিত্রের বিশুদ্ধতা এই তিনটি মহাভাব ঐ ধর্ম্ম কার্য্যে দেখাইতে পারিতেছেন না। আমরাই দেখিতেছি যে, নিকৃষ্ট জাতিদিগের প্রতি ইউরোপ সর্ব্বদাই উদ্ধত হইয়া আছে। তাহাদিগকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ রাখা, তাহাদিগকে ঘৃণা করা, তাহাদিগের মানবত্ব অস্বীকার করা, এ সকল ভাবে কি খ্রীষ্টানদেশ সমুদয় নিত্য দূষিত নহে? আবার যুদ্ধপ্রবৃত্তি খৃষ্টানদিগের অলঙ্কার হইয়া পড়িয়াছে। ইউরোপীয় প্রধান প্রধান দেশ যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত হইয়া আছে। এই মুহূর্ত্তেই যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া দিতে পারে। আবার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমরা কেবল ইউরোপের স্ত্রীলোকসম্বন্ধীয় ঘৃণিত আইন সমূহকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে পারি যে, ঐ মহাখণ্ডে পাপকে প্রশ্রয় দেওয়া রাজপুরুষদিগের কর্ত্তব্যবোধ হইয়াছে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ভাবে ঈশাই-ধর্ম্ম দূষিত হওয়াতে ইহার উন্নতির পথে

ব্যাঘাত হইয়াছে এবং ইহা আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। তাহার উপর অন্যদিক হইতে নিরীশ্বরবাদী-দিগের আক্রমণ সেই খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের উপর পড়িতেছে। ঈশ্বর দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছেন। নববিধানের কার্য্য ইউ-রোপে ধর্ম্ম-সমন্বয় আনা। ধর্ম্ম-সমন্বয় আসিলে নিকৃষ্ট জাতির প্রতি আর সে অবমাননা থাকিবে না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যে পরিত্রাণ-বিচ্যুত, তাহারা যে জ্ঞানধর্ম্মবিবর্জ্জিত, এ বিশ্বাস চলিয়া যাইবে। সকল জাতির মধ্যে বিধান আসি-য়াছে, সেই সেই বিধান একটি একটি মহান্ সত্য প্রচার করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে এবং সকল লোকই জাতি-নির্ব্বিশেষে ঈশ্বরের কৃপাপাত্র, এই সকল ভাব নববিধান হইতেই আসিবে। ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই উভয় সম্প্র-দায়েই সত্য আছে, দুইটিই এক ধর্ম্মের দুটি দিক—এ জ্ঞান হইলে ইউরোপে যে পরস্পরে বৈরিতা দৃষ্ট হয় তাহা চলিয়া যাইবে এবং ইউরোপায়েরা পরস্পরের সঙ্গে মারামারি, পরস্প-রের গলা কাটাকাটি হইতে রক্ষা পাইবে। তাহার পর বিধানের ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশিত হইবে। ভগবান এক—এক হইয়া নানা রূপে প্রকাশিত হইতেছেন। তিনি অনন্ত, জীবন্ত, জ্বলন্ত শক্তি হইয়া পিতাভাবে বাহ্যজগতে বর্ত্তমান। সকল পদার্থে তিনি শক্তি হইয়া বিরাজমান। তিনি জলে, স্থলে, বৃক্ষে, ফলে ফুলে, আকাশে, নক্ষত্রে, মেঘে, বজ্রে, বিদ্যুৎ-মালায়, অন্নে, বস্ত্রে, মানসিক শক্তিতে, রক্তের প্রতিবিন্দুতে,

নিশ্বাসপ্রশ্বাসে অনন্ত জীবনীশক্তি হইয়া বিদ্যমান। পুত্র হইয়া তিনি ইতিহাসে দেখা দিতেছেন। পৃথিবীতে যত প্রকাণ্ড ঘটনা ঘটিয়াছে, মহাপুরুষেরা আসিয়া জগতকে যে নূতন ভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, প্রতি জীবনে যে সকল অদ্ভুত ঘটনা ঘটিতেছে,এ সকল তাঁহারই লীলা। আবার নব উৎসাহ, নব উদ্যম, নব প্রেম, নব বর লইয়া তিনি সাধুদিগকে স্বর্গীয় মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া নূতন মন্ত্র দিয়া পৃথিবীকে যুগে যুগে কম্পিত করেন—ইহা তাঁহারই দয়ার প্রমাণ। তিনি সর্ব্বস্থানে সর্ব্বকালে বর্ত্তমান। আমি তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি না। ঊর্দ্ধে অধোতে, বাহিরে ভিতরে সর্ব্বত্র তিনি। আমার রক্তের স্রোতে তিনি, নিশ্বাস প্রশ্বাস তাঁহারই শক্তি। আমি যখন নিদ্রিত, তখন তিনি শক্তিরূপে সেই নিশ্বাস প্রশ্বাস এবং সেই রক্তস্রোত সঞ্চালিত করেন। সামাজিক সকল আচার ব্যবহারে তাঁহাকে আহ্বান করি। বিদ্যাশিক্ষা করিবার সময় এবং অন্য সৎকার্য্য করিবার সময় তাঁহারই বল ভিক্ষা করি। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ তাহারই আদেশে হয়। এমন কোন পরমাণু নাই, এমন কোন শাস্ত্র নাই যাহাতে তিনি নাই। বিজ্ঞান প্রকাণ্ড ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস আমাদিগের ধর্ম্মকথা, সাধুজীবন আমাদিগের শাস্ত্র এবং প্রত্যেকের জীবন এক এক বেদ। যে যে স্থান হইতে নিরীশ্বর শত্রু ঈশ্বরকে তাড়াইয়া দিয়াছে সেই সেই স্থানে নববিধান তাঁহাকে স্থাপন করিবে। ভারতে প্রত্যেক পদার্থে খণ্ড ঈশ্বর আছেন;

নববিধান সেই খণ্ড ঈশ্বরকে পূর্ণব্রহ্ম করিয়া বসাইবেন। আর ইউরোপে যেখানে ঈশ্বর নাই, সেইখানে সেই ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিবেন।

কিরূপে বিধাতা আপন অধিকার লাভ করিবেন? ধর্ম্ম-সমন্বয় দ্বারা। ঈশ্বর সর্ব্ববিধানকর্ত্তা, পৃথিবী তাঁহার লীলা-ক্ষেত্র, সকল জাতির মধ্যে তিনি সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন, প্রত্যেক জীবনে তিনি লীলা খেলা করেন—এই সকল মহা-সত্য, ধর্ম্মসমন্বয় আমাদিগকে বলিয়া দিবে। এই ধর্ম্মসমন্বয় আমরা কিরূপে করিতে পারিব? প্রত্যাদেশ দ্বারা? প্রত্যা-দেশ কিরূপে হইবে? আত্মবিসর্জ্জন দ্বারা। মনকে খালি করিলেই প্রত্যাদেশ হইবে। সক্রেটিস্ বলিয়া দিতেছেন—"বল আমি কিছুই জানি না," তৎক্ষণাৎ মন অহঙ্কারশূন্য হইল। শাক্য বলিতেছেন—"হৃদয়ের রিপুরাশিকে জয় কর," তৎ-ক্ষণাৎ হৃদয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যশূন্য হইল। ঈশা বলিলেন—"পিতাকে স্বীয় ইচ্ছা সমর্পণ কর। বল, আমার ইচ্ছা নহে, তোমরই ইচ্ছা।"—তৎক্ষণাৎ আত্মা স্বেচ্ছা-চারশূন্য হইল। যখন মন এইরূপে শূন্য হয়, তখন পবিত্রাত্মা ভগবান আপনি আসিয়া সাধকের হৃদয় অধিকার করেন। তখন সে একেবারে আত্মেচ্ছাশূন্য। আর সে আপনি কথা কহে না, আপনি দেখেনা, আপনি শুনেনা, আপনি কার্য্য করে না। ভগবান অন্তর অধিকার করিয়া, ভক্তকে সকল বিষয়ে পূর্ণ করেন। ভক্ত তখন ভগবানের চক্ষু দিয়া ভগবানকেই

দেখেন। কোন স্থান আর ভগবৎশূন্য নহে, কোন ঘটনা আর নিরীশ্বর নহে, কোন দেশ আর ভগবদ্‌বর্জ্জিত নহে, কোন শাস্ত্র আর মনুষ্যকল্পিত নহে। পৃথিবী বিধাতায় পূর্ণ।—

"জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।"

এই নববিধান জগতকে পূর্ণব্রহ্ম দিতে আসিয়াছেন। আর ভয় নাই। আর নাস্তিকতা ও পাপ আমাদিগকে দগ্ধ করিবে না। ভক্তিসুরা, প্রেমসুরা আমাদিগের চক্ষুকে অনুরঞ্জিত করিলে আমরা পৃথিবীকে বিচিত্রবর্ণে, বিচিত্র আভরণে ও বিচিত্ররূপে অলঙ্কৃত দেখিতে আরম্ভ করিব। আর জগৎ ঈশ্বরবিহীন মরুভূমি থাকিবে না। ঈশ্বর নিজ হস্তে প্রতি-হৃদয়ে প্রস্রবণ খুলিয়া দিয়াছেন, তাহা হইতে ভক্তিনদী উদ্‌গত হইয়া গৃহ, সমাজ, দেশ ও মানবজাতিকে বিশ্বাসে প্লাবিত করিবে। তিনি নিজে চক্ষুকে উন্মীলিত করিয়া দিবেন। যে স্থান অর্থহীন ছিল সেখানে অর্থ বুঝিব; যেখানে দয়া ছিল না সেখানে দয়া দেখিব, যেখানে জ্ঞান দেখিতে পাই নাই, সেখানে জ্ঞান সমুজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হইবে; এবং যেখানে ঈশ্বর ছিলেন না, সেখানে স্বয়ং ঈশ্বর বিরাটমূর্ত্তি লইয়া বিরাজমান হইবেন।